সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর

পত্রাবলী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর

পত্রাবলী

১ম খণ্ড

সংকলনে : আসেম নু'মানী
অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুল আযীয
সম্পাদনা : আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন-২৫১৭৩১

আঃ প্রঃ-১৩৬

প্রকাশ কাল
শাওয়াল : ১৮০৯
জৈষ্ঠ : ১৩৯৬
জুন : ১৯৮৯

বিনিময়ঃ শোভন- ৫০'০০
সুলভ- ৩৮'০০

প্রচ্ছদঃ আবদুর রউফ সরকার
মুদ্রণেঃ
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

مکاتیب سید ابوالاعلیٰ مودودی (رح)-এর বাংলা অনুবাদ

SAYYED ABUL A'LA MAUDOODI-R PATRABOLY
Compiled by Asim Nomany
Published by Adhunik Prokashani
25, Shirishdas Lane, Banglabazar,
Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25, Shirishdas Lane, Dhaka-1100

Price:-White —Taka 50'00
News —Taka 38'00

আমাদের কথা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তাআলা যার কল্যাণ চান তিনি তাকে দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বুঝ জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।" মাওলানা মওদূদী (র')-এর জ্ঞান রাজ্যের দ্বারপথে প্রবেশ করার পর তাঁর সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলার সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের তিনি "ফাকাহুহু ফীদ্বীন"-এর নিয়ামত দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন। তাইতো দেখি, তার মুখের প্রতিটি কথা এবং তার লিখিত প্রতিটি বাক্য আল্লাহ্র দ্বীন বুঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কদম কদম সম্মুখে এগিয়ে নিচ্ছে। গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে রেখে যাওয়া জ্ঞানভাণ্ডার তো রয়েছেই তা ছাড়াও জ্ঞান পিপাসুদের তাকীদে তাঁর লিখিত চিঠিগুলোও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে গেছে, এমনকি আল্লাহ্র রহমতে তাঁর মৌখিক বক্তব্যগুলো পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে গৃহীত হয়ে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে গেছে। জনাব আসেম নু'মানী যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে মাওলানার বেশ কিছু পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং উর্দু ভাষায় "মাকাতীবে মওদূদী" নামে সেগুলো দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানার সবগুলো গ্রন্থই বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় একাডেমী একাজে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। মাকাতীবে মওদূদী উভয় খণ্ডই "সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পত্রাবলী" নামে বংগানুবাদ হয়ে গেছে। আমরা এজন্যে আল্লাহ্ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছি যে, প্রথম খণ্ড পাঠকগণের হাতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ডও শিঘ্রী প্রকাশিত হবে- ইনশাল্লাহ্।

আমরা আশাকরি মাওলানার পত্রাবলী পড়ে পাঠকগণ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। আর পাঠকগণকে উপকৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

পত্রাবলী সম্পর্কে

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) সাহেবের একান্ত সচিব
মালিক গোলাম আলীর বক্তব্য

ইলম ও চিন্তা গবেষণার যোগ্য আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দক্ষতায় আপ্লুত ব্যক্তি তো কাগজ ও কলমকে নিজের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহার করেন। এমন ব্যক্তিকে নিয়মিত বই লেখার কাজ ছাড়া সাধারণভাবে চিঠিপত্র লেখা এবং লিখিত আকারে প্রশ্নোত্তরেরও মুখোমুখী হতে হয়। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) ব্যক্তিত্বও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলনা। মরহুম মাওলানা যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ের চিঠি-পত্রের প্রতি তেমন আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন না; তথাপি অগণিত লোক চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মধ্যে মরহুম মাওলানার গ্রন্থরাজির পাঠকবৃন্দ অন্তর্গত। গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের সময় তাদের মন-মানসে কোনো প্রশ্ন, সন্দেহ কিংবা অভিযোগ দেখা দিলে সেগুলো তারা মুহতারাম মাওলানার কাছে পত্র মাধ্যমে তুলে ধরেন। এমন ভদ্র মহোদয়গণও যোগাযোগ করেন যারা মরহুম মাওলানার ধ্যান-ধারণার সাথে সরাসরি পরিচিত নন। তারা শুনা কথার ওপর ভিত্তি করে মাওলানা সাহেব সম্পর্কে ভুল কিংবা নীর্ভুল মন্তব্য করেন। আর এ কারণেই চিঠি পত্র লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাদের মধ্যে আছে শিক্ষিত অশিক্ষিত দ্বীনি মহল, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্র-শিক্ষক, মোট কথা সব ধরনের লোক। আবার কতিপয় লোক এমন প্রকৃতির যারা শুধুমাত্র মুহতারাম মাওলানার (রঃ) ধর্মীয় দূরদর্শীতার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তার কাছে ইলমী ও ফিকহী মাসায়েল জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং কুরআন হাদীসের জটিল স্থানসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চাইতেন। মোটকথা, সব ধরনের রুচি ও প্রকৃতি সম্পন্ন লেখক সর্ব বিষয়ে মাওলানা সাহেবকে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি জবাবদানে তাদেরকে নিশ্চিতও করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

এ ধরনের প্রশ্নোত্তরগুলো রাসায়েল ও মাসায়েল নামে এ পর্যন্ত চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিগত চার পাঁচ বছর যাবত এ ধারা বন্ধ ছিল। মুহতারাম

মাওলানার পত্রালাপের ব্যাপারে আমার সহযোগী জনাব মুহাম্মদ সুলতান আসিম নোমানী সাহেব বর্তমানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এমন বেশ কিছু জবাব একত্রিত করেন যেগুলো মরহুম মাওলানা সাহেব গত কয়েক বছর থেকে লিখে আসছেন। এগুলো মাসিক তর্জুমানুল কুরআন অথবা অন্য কোনোভাবে আজও প্রকাশিত হয়নি। এসব পত্রাবলীর অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত এবং করণিক কর্তৃক লিখিত। তবে এ কারণেই চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে এমন পরিচ্ছন্নতা, অকপটতা ও সরলতার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে যা সহৃদয় পাঠকবর্গের মনকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা রাখি। মুহতারাম মাওলানার (রঃ) শত ব্যস্ততার মধ্যেই এগুলোর ওপর একনজর বুলিয়ে নেয়াও নিশ্চিত হওয়ার গ্যারান্টি বৈকি। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌'র কাছে দোয়া করছি, যেন মুহতারাম মাওলানার অন্যান্য লেখার ন্যায় এ পত্রাবলীও পাঠকবর্গের জন্য উপকৃত হয় এবং জবাবদাতা, সংকলক, প্রকাশক সকলের শ্রম স্বার্থক হয়। আমীন।

সংকলকের আরজ

এ গ্রন্থটি আমার পরম সম্মানিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) সাহেবের অপ্রকাশিত পত্রাবলীর সংকলন। এগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন পত্রাবলীর জবাবে লেখা হয়েছে। যেসব চিঠির জবাব লম্বা ধরনের এবং নির্বিশেষে সকলের জন্যে প্রয়োজনীয় সেগুলো মাসিক তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়। এ চিঠিগুলো প্রশ্নসহ রাসায়েল মাসায়েল নামে ৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তর্জমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়নি এমন বেশ কিছু চিঠিও রয়েছে যে গুলোর গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোনো অংশে কম নয়। সেসব চিঠির অধিকাংশগুলো নিছক এ উদ্দেশ্য একত্রিত করেছি যে, এগুলোর উপকারিতা ও দিক নির্দেশনার যে পরিমন্ডল চিঠির প্রাপকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেটাকে ঐসব লোকদের নিকটও পৌছে দিতে চাই যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুহতারাম মাওলানার (রঃ) আল্লাহ প্রদত্ত দূরদর্শীতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে চান। এ ধরনের পত্র সমষ্টির এটা প্রথম কিস্তি বা প্রথম খন্ড হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর ইনশা আল্লাহ যথাশীঘ্র এর ২য় খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা রইলো। এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলো যদিও প্রচলিত অর্থে ব্যক্তিগত যোগাযোগ নয় তথাপি এগুলোর মধ্যে অকৃত্রিমতা, সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা পরিপূর্ণ রূপ এমনভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, তাতে ব্যক্তিগত যোগাযোগের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে এ চিঠিগুলোর মাধ্যমে মুহতারাম মাওলানা (রঃ) সাহেবের ব্যক্তিগত জীবন এবং জীবনের কোনো গোপন সূত্র প্রকাশ করার সামান্যতম প্রবণতাও নেই। কেননা, মাওলানার (রঃ) জীবনে গোপন প্রকোষ্ঠের কোনো অস্তিত্ব আদতেই নেই। সঠিক অর্থে তাঁর জীবন ছিল একটি খোলা বইয়ের মতই। এতদসত্ত্বেও চিঠিগুলো পাঠকবর্গের জন্য মাওলানার ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মেযাজের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে পরিচয় দান করতে নিশ্চিতভাবে উপকৃত প্রমাণিত হবে। মরহুম মাওলানা সাহেবের লেখার ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার ভার আলোচক ও সমালোচকদের ওপর। তবে চিঠিগুলো সংকলন করার এ মুহূর্তে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা অপ্রাসংগীক হবে না যে, চিঠিগুলো এমন আরশি বিশেষ যার মাধ্যমে মুহতারাম মাওলানার (রঃ) ব্যক্তিত্বের সব দিক খুব কাছ থেকে দেখা যেতে পারে। তাঁর চিন্তা পদ্ধতি, আবেগ অনুভূতি, অনুধাবন ও উপস্থাপন রীতি, লেখনীর বৈশিষ্ট্য, দ্বীনি অন্তরদৃষ্টি, চিন্তার বিরাটত্ব, সাহিত্যিক মান, জ্ঞানপিপাসা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, দৃষ্টিভংগি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ, ফিকহী মাযহাব এবং আচার-আচরণ মোট কথা তাঁর সামগ্রিক জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার জ্যোতি এ সব চিঠির মাধ্যমে

চিন্তা ও দৃষ্টিকে সম্মোহিত করবে না। প্রতিটি চিঠি লেখকের ব্যক্তিত্বের একটি চিত্তাকর্ষক চিত্রের ধারক ও বাহক। আর মন মগজে উৎসারিত হয় আল্লামা ইকবালের সেই বিরাট নৈপুণ্য যা তিনি ব্যক্ত করেছেন নিজ ভাষায় এ ভাবে –

مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں
بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق

চিন্তার রাজ্যে তিনি প্রভাতের সূর্য সম
সরল স্বাধীন কথা বটে মানে তার সূক্ষ্মতম।

এ সংকলনটির বিষয়বস্তুর তালিকার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি দিলেই চিঠিগুলোর আলোচ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার ধারণা লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং সংগত কারণে আশা করা যায় যে, পত্রাবলীর এ সংকলনটি এ ধরনের যে কোনো অপর পত্রাবলীর তুলনায় একটি স্বতন্ত্র ও একক মর্যাদার অধিকারী সংকলন হিসেবে গণ্য হবে।

সংকলনের চিঠিগুলোর সন তারিখের ধারবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু এতো বেশী রকমারী যে এগুলোকে নির্দিষ্ট শিরোনামে একত্রিত করা অসম্ভব ছিল। এ কারণেই সংকলনটির সূচীপত্র তৈরী করার পরিবর্তে শুরুতে প্রতিটি চিঠির আলোচ্য বিষয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে। অথচ দু'তিন জায়গায় এ নীতি পালিত হয়নি। একই বিষয়ের কিছুসংখ্যক চিঠি সন তারিখ অনুযায়ী সাজানোর পরিবর্তে এক জায়গায় একত্রিত করা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে কোথাও ফুট নোট দেয়া হয়েছে। পত্র লেখক কোন বিষয়ে মরহুম মাওলানার রায় চেয়েছেন অথবা কোনো বিশেষ আলোচনার পটভূমি কি–একথা জানার জন্যেই এরূপ করা হয়েছে।

এ সংকলনের অন্তর্গত চিঠিগুলোর সময়কাল ছিলো ১৯৬২ সনের মে মাস থেকে ১৯৬৮ সালের আগষ্ট পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়, এর আগের চিঠি–পত্র রেকর্ড করা হয়নি। তবে আমার কাছে লিখিত ১৯৫৯ সালের এ চিঠিখানা এখানে সংযোজন করা হলো। চিঠিটি আমি সংরক্ষণ করে আসছিলাম। পত্রাবলীর ২য় খন্ডে ১৯৬৮ সনের পরের চিঠিগুলো সন্নিবেশিত হবে। তাছাড়া এ গ্রন্থে সংকলিত চিঠিগুলোর পূর্বেকার পত্রগুলোও খুঁজে বের করে এ সংকলনে সংযোজন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। অতএব, বন্ধু–বান্ধব ও সাথীদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যাদের কাছে মরহুম মুহতারাম মাওলানার কোনো লেখা বা চিঠি রক্ষিত আছে তারা যেন দয়া করে সেগুলো আমাকে ধার স্বরূপ দান করে বাধিত করবেন। এগুলোর অনুলিপি করার পর যত্ন সহকারে ফেরত দেয়া হবে। বন্ধু ও সাথীগণ আমাকে এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞ করবেন বলেই আমার একান্ত কামনা। পরন্তু এমন একটি কল্যাণকর কাজে আপনাদের অংশগ্রহণ করা হবে। যার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

পরম সম্মানিত জনাব মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সাহেবের (রঃ) কাছে এ বিশেষ অনুগ্রহের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি মেহেরবানী করে এ চিঠিগুলো সংকলন ও প্রকাশ করতে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং অত্যধিক ব্যস্ততা ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও পত্রাবলীর এ সংকলনটির ওপর একবার নজর দেয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমি পরম শ্রদ্ধেয় ও স্নেহ পরায়ণ জনাব মালিক গোলাম আলী সাহেবেরও [মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) সাহেবের একান্ত সচিব] শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি সংকলনটির কেবলমাত্র বিন্যাস ও সংকলনের ব্যাপারেই নির্দেশনা দেননি বরং বইটি সম্পর্কে একটি অভিমতও লিখে দেন।

সংকলনটি প্রকাশের ব্যাপারে বন্ধুবর মুহতারাম হাফিজুর রহমান আইমান এম, এ সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার। পরন্তু সংকলনটি বিন্যাস্ত ও সংকলনের সর্বক্ষেত্রে তাদের কল্যাণকর পরামর্শ এবং বাস্তব সহযোগিতা আমাকে সব সময় প্রেরণা যুগিয়েছে। আমি তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

তাং ১২/২/১৩৯০বাং
১৯/৪/১৯৭০ ইং

আসেমনুমানী
৫, যিলদার পার্ক, ইছড়া, লাহোর

বিন্যাস তালিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

পত্র — ১

৪ সেপ্টেম্বর '৫৯

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। পবিত্র কুরআনে সৃষ্ট জগত সম্পর্কে যেসব অবস্থা ও গূঢ় রহস্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাতে একথার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, সে সময়ের সাধারণ লোকদের সাধারণ জ্ঞান এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত এমন জটিল বক্তব্য পেশ করা না হয় যা কোনোক্রমেই তাদের হজম করা সম্ভব নয়। যদি এ কৌশল অবলম্বন না করা হতো তবে দু'হাজার বছর পূর্বের লোকদের জন্য সেসব তত্ত্ব যতোই গ্রহণযোগ্য হতো না কেন, কিন্তু সে সময়ের লোকেরা এগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে যেতো। এবং সেগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করে বসতো। এভাবে আজও এমন অনেক অজানা তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো আজকের লোকদের কাছে পেশ করা হলে তারা কখনো তা গ্রহণ করবে না। অথচ আজ থেকে দু'হাজার বছর পর এগুলোই অতীব সাধারণ বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, কুরআনে এমন কোনো জিনিসের বর্ণনা নেই যা প্রকৃত সত্যের বিপরীত। কিন্তু কুরআন সৃষ্ট জগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সকল নিগূঢ় রহস্যের কথা বলে দেয়নি। বরং তার প্রথম সম্বোধনকারী লোকদের মস্তিষ্ক যতোটুকু ধারণ করতে পারে শুধু ততোটুকুই সে বলেছে।

পৃথিবীর গতি, তারকারাজির আবর্তন এবং আকাশ মণ্ডলির গঠন প্রণালী সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য বুঝতে হলে এ মৌলিক কথা মনে রাখা দরকার। সে অতীতে যদি পৃথিবী গতিশীলতার কথা উল্লেখ করা হতো তাহলে মানুষের মাথা চক্কর খেতো। কিন্তু বর্তমানকালে যদি পৃথিবীকে স্থির এবং সূর্য ও অন্যান্য তারকারাজিকে তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান বলে ঘোষণা করা হয়, তাহলে স্কুলের একটি সাধারণ ছাত্রও তাতে বিদ্রূপ করতে বাধ্য হবে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথা বলা হয়নি। কেননা কুরআন পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষা দেবার জন্যে আসেনি। যে উদ্দেশ্যে সে এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দলিল প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছে, [illegible] [illegible] একরকম দলিল [illegible] [illegible] [illegible]

পত্র—

বর্ণনাকে কোনো একটিমাত্র বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবো যা কোনো একটি মাত্র যুগের অভিজ্ঞতা বা ধারণার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্য যুগের মানুষের প্রতিষ্ঠিত দর্শন ও পর্যবেক্ষণ সেটাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

আমি যার ওপর ভিত্তি করে বলেছি যে, কুরআনের কোনো কোনো ইশারা-ইঙ্গীত পৃথিবীর গতিশীলতার সমর্থন করে তা এ কুরআনে মাজীদ সৌরজগতের যে ধারণা পেশ করে সে অনুযায়ী তা হচ্ছে অনেকগুলো সমুদ্রের মতো, যাতে কোনো জিনিস অবিরাম সাঁতার কাটছে। কুরআন সৌরজগতের পরিবর্তে সৌরনক্ষত্ররাজিকে ঘূর্ণায়মান দেখাচ্ছে। অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি সৌরজগতের মধ্যে সাঁতার কাটছে। এখন পৃথিবী যদি সৌরজগতের একটি নক্ষত্র হয়, তবে সেটাও অবশ্যই স্থীর নয়। বরং অবিরাম সাঁতারই কেটে যাচ্ছে। কুরআন পৃথিবীর স্থিরতার যে কথা উল্লেখ করেছে তা আমাদের দৃষ্টিতে, সৌর নক্ষত্ররাজির নিয়মানুসারে নয়।

কুরআনের কোনো কোনো তাফসীরকার ধ্রুবতারার সাথে যমীনের সম্পর্ক একরকম থাকার যে দলিল পেশ করেছে তার উপমাটা ঠিক এরকম যেমন: দু'টি রেলগাড়ী পাশাপাশি লাইনে একই গতিতে একসাথে চলতে দেখে কেউ মনে করলো উভয় গাড়ী দাঁড়ানো অবস্থায় আছে এবং নিজের এ অনুভূতিকে গাড়ী স্থির থাকার দলিল হিসাবে পেশ করলো। আপনি অনেক সময় দেখে থাকবেন, আপনি যে ট্রেনে বসে আছেন সে ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশের লাইনের দাঁড়ানো গাড়ীটির দিকে লক্ষ্য করলে যথেষ্ট সময় পর্যন্ত আপনার এই উপলব্ধি হবে যে, পাশের গাড়ীটিই চলছে, আপনার গাড়ীটি নয়। এ ধরনের অনুভূতি প্রকৃত সত্যকে বর্জন করার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে কি?

প্রাপক-
মুহাম্মদ সুলতান সাহেব,
কসুর, জিলা-লাহোর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ২

১৯ মে '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। 'পর্দা' গ্রন্থ রচনা কালে সাধারণ অনুবাদকদের মতো আমিও আইয়েম- এর অর্থ স্বামীবিহীন নারী মনে করতাম। কিন্তু সূরায়ে নূরের

তাফসীর লেখার সময় যখন শব্দটি সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করলাম তখন জানতে পারলাম যে, শব্দটি এমন পুরুষের জন্যেও ব্যবহার হতে পারে যার কোনো স্ত্রী নেই।

পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের ঘটনা নির্ভরযোগ্য হাদীসে বিবৃত হয়েছে। এতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হচ্ছে দিন রাতে পাঁচ বার নামায পড়া বেশী কিছু নয়। বরং মানুষকে যতবার আল্লাহকে ইবাদত করা উচিত সে তুলনায় খুবই কম। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ পাঁচ সময়ের কোনো একটি সময়ের নামায ছেড়ে দেয়া যেনো দশটি নামায পরিত্যাগ করা, একটি নয়।

প্রাপক-
শামীম আহমদ সাহেব,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৩

১৫ জুন '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম, ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। প্রত্যেক মানুষের বয়সই আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এটা কারো জানা নেই যে, আল্লাহ কার বয়স কি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত এটা জ্ঞাত হওয়া না যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কিভাবে বলা যায় যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বয়স থেকে অতিরিক্ত বয়স হাসিল করে নিয়েছে।

প্রাপক -
সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব,
চক-১১/১০ R, জিলা - মুলতান

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৪

১৫ জুন '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। ইসালে ছওয়াব এক প্রকার দোয়া, একজন লোক একটি নেক কাজ করে আল্লাহর কাছে এ দোয়া করে যে, একাজে আপনি যে ছওয়াবই দান করেছেন তা আমার পক্ষ থেকে অমুকের রূহে পৌছে দিন। এ ধরনের দোয়া করার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। এটা সম্পূর্ণ জায়েয পদ্ধতির দোয়া। তবে একথা সম্পূর্ণ আল্লাহর মর্জির ওপর নির্ভরশীল যে, তিনি আমাদের অন্যান্য দোয়ার মতো এ দোয়াও কবুল করবেন কিনা। যদি তিনি কবুল করেন তবে ছওয়াব ঐ ব্যক্তি পাবেন। অন্যথায় আমাদের নেক আমলের পুরস্কার কখনো বৃথা যাবে না। ছওয়াব ব্যক্তির কাছে না পৌছালে তা আমাদের হিসেবের খাতায় সংযোজন হবে।

প্রাপক–
গোলজার মুহাম্মদ সাহেব,
সিভিল লাইন, রাওয়ালপিন্ডি।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৫

২৯ জুন '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আশ্চর্য, মসীহর (আঃ) অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে এখনো আপনার সন্দেহের অবসান হয়নি। নুযুলে মসীহ সম্পর্কীত হাদীসগুলো যদি আপনি মনোযোগ সহকারে পড়তেন তবে আপনি নিজেই জানতে পারতেন যে, মসীহ (আঃ) যেভাবে অবতরণ করবেন সেটা হবে এমন পদ্ধতি যে, তাঁকে চিনতে মুসলমানদের একটুও কাল বিলম্ব হবে না। হাদীসে উল্লেখ আছে, যে সময় দামেস্কে মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে সংগ্রাম করার জন্যে সংঘবদ্ধ হবে এবং ফজরের নামাযের জন্যে দাঁড়াবে, সে সময় হঠাৎ হযরত মসীহ (আঃ) বাইদা মিনারার নিকট অবতরণ করবেন। অতঃপর মুসলমানগণ তাঁকে নামায পড়ানোর অনুরোধ করবেন।

প্রাপক–
শেখ আবদুর রশীদ সাহেব,
শেরশাহ কলোনী, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৬

২০ জুন, '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। দাঁড়ি রাখার পর কামিয়ে ফেললে কোনো ব্যক্তি মোরতাদ হওয়ার সীমান্তে পৌঁছে না বটে, কিন্তু এটা অবশ্যই সাংঘাতিক ধরনের পরাজয় এবং দ্বীন থেকে পশ্চাদাপসরন। আর যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সাংঘাতিক ধরনের নৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যার থেকে এ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তার সংগী–সাথীদের উচিত তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা ফিকির করা।

প্রাপক–
আবদুর রশীদ সাহেব
নাযেমাবাদ, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৭

২০ জুন '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। নিজের অভাব ও প্রয়োজনের জন্যে আল্লাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর কাছে দোয়া করা কোনো খারাপ কথা নয়, বরং প্রকৃত বন্দেগীর দাবীই এটা। এ কারণে ইবাদতের সময় দোয়া সম্পর্কে মনে যদি কোনো খটকা লাগে তবে তার জন্যে মন খারাপ করা উচিত নয়। এমনিভাবে ভয়–ভীতি, আকুতি–মিনতি কম হওয়ার কারণেও মন খারাপ না করা উচিত। যে ইবাদত আপনি করতে সক্ষম তা অবশ্য করতে হবে এবং আল্লাহ'র কাছে দোয়া করতে থাকুন যেনো তিনি আপনাকে উত্তম পন্থায় ইবাদত করার তৌফিক দান করেন। আমিও আপনার মংগলার্থে দোয়া করছি।১

প্রাপক–
নায়ীম গিলানী সাহেব,
কাটাস, জিলা–ঝিলাম।

খাকসার,
আবুল আ'লা

---

১. পত্র লেখক চিঠিতে ইবাদতে আকুতি–মিনতি কম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং নিজের প্রয়োজনের জন্যে আল্লাহ'র কাছে দোয়া করাকে স্বার্থপরতা মনে করে মাওলানার কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। (সংকলক)

পত্র—৮

জুলাই'৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমরা মুসলমান এ বিশ্বাস পোষণ করি যে, সাইয়েদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা বিশ্বের সর্বকালের পথ-প্রদর্শক। আপাতঃ দৃষ্টিতে কোনো মানব সম্পর্কে এরূপ কথা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় বটে, কিন্তু যে মহান ব্যক্তি সম্পর্কে এ দাবী করা হয়েছে তাঁর কাজ বাস্তবিকই এমন যে তার জন্য এ উক্তি অতিরঞ্জিত নয় বরং বাস্তব সত্য।

বিশ্বজনীন পথ প্রদর্শকের প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে– তিনি কোনো নির্দিষ্ট জাতি, বংশ কিংবা শ্রেণীর মংগলের জন্যে নয় বরং গোটা বিশ্বের মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করবেন। সমগ্র জাতির মানবগোষ্ঠী কোনো এক ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা তখনই মানতে পারে যখন তিনি সমগ্র জাতি এবং গোটা মানবগোষ্ঠীকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি হবেন সকলের শুভাকাংখী। পথ প্রদর্শনের কাজ কোনোক্রমেই একের ওপর অন্যের প্রাধান্য দেবে না। দু'জাহানের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে এ বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁর জীবন কোনো দেশ বা জাতি পূজারী ছিল না। বরং তিনি ছিলেন মানবপ্রিয় জীবনের অধিকারী। এ কারণেই তাঁর আমলে হাবশী, ইরানী, রোমীয়, মিশরীয় এবং ইসরাইলীরা আরবদের মতোই তাঁর কাজের সাথী এবং আত্মোৎসর্গকারী হয়ে যায়। তাঁর ইন্তেকালের পরেও দুনিয়ার প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক বংশের লোক তাঁর অনুসারীদের মধ্যে শামিল হয়ে একটি মিল্লাতে পরিণত হয়।

বিশ্ব নেতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর পেশকৃত আদর্শ হতে হবে সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন। সারা পৃথিবীর মানুষকে তা সমভাবে পথ প্রদর্শন করবে এবং এতে মানবজীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান উপস্থিত থাকবে। খাতামুন নাবিয়্যীনের হেদায়াত এ ব্যাপারেও পূর্ণাংগ। তিনি কোনো নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির সমস্যা নিয়ে আলোচনার স্থলে গোটা মানব গোষ্ঠীর সমস্যা সামনে রাখেন এবং এসব বিষয়ে এমন পথ নির্দেশনা দান করেন যার ওপর গোটা পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠী সামাগ্রিকভাবে আমল করলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ব্যতিরেকে কোনো মানুষ সারা বিশ্বের পথ প্রদর্শক হতে পারেনা তা হচ্ছে এই যে, তাঁর নেতৃত্বে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হবে না বরং তা

হবে সর্বকালের জন্যে সঠিক ও বাস্তব। বিশ্বজনীন পথ প্রদর্শক সময় ও কালের গন্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এ উপাধীতো সেই ব্যক্তির জন্যেই শোভা পায় যার পথ নির্দেশনা দুনিয়া লয় পর্যন্ত মানুষের উপকার করতে থাকে। এ মাপকাঠিতেও যদি কারো শিক্ষা ও হেদায়াত পূর্ণ সফলতা লাভ করে থাকে তবে তা শুধু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই শিক্ষা ও হেদায়াত। এটা ছিল আলোর এক উঁচু মিনার যা শত শত বছর যাবত দুনিয়াকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে। সময় যতোই অতিক্রান্ত হচ্ছে তার আলোকছটা ততোই অধিকতর বিকিরিত হচ্ছে।

বিশ্ব নেতা হওয়ার জন্যে চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই যে, তিনি শুধু নীতিমালা পেশ করেই ক্ষান্ত হবেন না বরং নিজের পেশকৃত নীতিমালা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখায়ে দেবেন এবং এ নীতিমালার ভিত্তিতে একটি জীবন্ত সমাজ সৃষ্টি করবেন। শুধুমাত্র নীতিমালা পেশকৃত ব্যক্তি বড়জোর একজন চিন্তাবিদ হতে পারে। নেতা হতে পারে না। এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একটি নীল নক্সাই পেশ করেননি। বরং সে অনুযায়ী একটি জীবন্ত সমাজ গড়ে দেখায়ে দেন। তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে লাখো মানুষকে আল্লাহর সমীপে আনুগত্যের মাথানত করতে বাধ্য করেন। একটি নতুন ব্যবস্থা –নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বের সামনে এর বাস্তবতা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন যে, তাঁর নীতিমালার ওপর কত ভালো, কত পবিত্র, কত নেকার লোকের আবির্ভাব হতে পারে।

এ হলো ওসব কার্যাবলী যার ভিত্তিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের বিশ্বজনীন পথ প্রদর্শক হন। তাঁর শিক্ষা, কোনো নির্দিষ্ট জাতির সম্পদ নয়। বরং গোটা মানবজাতির সম্মিলিত মিরাস। যার ওপর কারো অধিকার অন্যের অধিকারের চেয়ে কম বা বেশী নয়। যে ইচ্ছা করে সে এ মীরাস দ্বারা উপকৃত হবে, আর যে চাইবে না সে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হয়ে থাকবে।

প্রাপক–
সম্পাদক সমীপেষু
ইত্তেফাক।

থাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৯

২৭ আগষ্ট, ১৯৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। দ্বীনের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা জেনে খুশি হয়েছি। আপনি আমার লিখিত নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলো অধ্যায়ন করুনঃ ইসলাম পরিচিতি, হাকীকত সিরিজ, ইসলামের জীবন পদ্ধতি, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। এর সাথে সাথে যদি প্রত্যহ তাফহীমুল কুরআনের সাহায্য নিয়ে পবিত্র কুরআন নিয়মিত ভাবে এক রুকু করে পড়েন তাহলে উপকৃত হবেন। পরন্তু আলেমদের ঝগড়ার দরুন জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা পরিত্যাগ করবেন না। ব্যক্তির অন্যায়ের কারণে দ্বীনের মৌলিক হুকুম মুলতবী করে দেয়া ঠিক নয়।

প্রাপক –
ফরজন্দ আলী শাহসুফী পুরী,
শিয়াল কোট

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১০

১৮ অক্টোবর, ৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আপনার 'সাইর ও সফর' যথারীতি পেয়ে আসছি এবং আগ্রহের সাথে পাঠ করি। এর মাধ্যমে আপনি সঠিক ধারণা এবং উপকারী অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে চলছেন। আপনার সমালোচনাও বেশ যথার্থ। সাংবাদিকতার নৈতিক সীমা আপনি যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন। আসলে আমাদের দেশের জন্যে এ ধরনের সাময়িকীরই প্রয়োজন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনার এ খেদমতে বরকত দান করুক।

২০শে অক্টোবরে (১৯৬২) আপনি যে বিপ্লব সংখ্যা বের করছেন তার উপলক্ষটি আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি। ইনকিলাব বা বিপ্লব শব্দটি সাধারণতঃ দুনিয়ার পরিবর্তনের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো উল্টে যাওয়া। আর এ অর্থে যদি কোথাও খাদতেই বিপ্লবের কিছু ঘটে থাকে তা হলে চোখ বুঁজে

বলা যায় সেটা মুসলিম দেশেই ঘটেছে। জাতির কর্মচারীগণের নিজেই অভিভাবক হয়ে যাওয়া এবং জাতিকে নিজের গোলাম বানানো বাস্তবিকই একটি পরিপূর্ণ বিপ্লব। তবে এ প্রকৃতির বিপ্লবকে 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে সম্ভাষণ করা কোনো সচেতন ব্যক্তির শোভা পায় না।

প্রাপক–
আরেফ দেহলভী সাহেব
সম্পাদক– "সাইর ও সফর", মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১১

১৮ অক্টোবর '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হলো মানুষের অন্ততঃ এতোটুকু চেষ্টা করা উচিত যাতে করে সে মূল কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তীতে উর্দুতে এর তাৎপর্য বুঝতে পারে।

কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব হাসিলের জন্যে কালামুল্লাহ পাঠ করা জরুরী। অনুবাদ পাঠ করা যথেষ্ট নয়। অনুবাদ পাঠে সওয়াব হবে কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যাবেনা।

প্রাপক–
মুহাম্মদ আমীন সাহেব, (জিভলারয)
খালিসপুর, খুলনা

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১২

৮ ডিসেম্বর '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। ইসলাম জাতীয়করণকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে না। অবশ্য এটাকে যদি সাধারণ-নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে ইসলাম এর বিরোধী।

কোনো বিশেষ ব্যবসা অথবা শিল্প যদি ব্যক্তি পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর না হয় অথবা ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালনা করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় সেটাকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা বৈধ।

প্রাপক –
আব্দুল গাফফার এ, করিম সাহেব,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১৩

৮ ডিসেম্বর '৬২

মুহতারামী ও মুকাররমী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। নামাযকে বরবাদ করার অর্থ নামায ছেড়ে দেয়া, নামায আদায়াতসহ আদায় না করা, নামাযের সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতায় গাফলতি করা এবং এর অর্থ আপনি যেটা বুঝেছেন সেটাও। নামাযের আসল ফায়দাসমূহ নষ্ট করা এবং নামায আদায় করা সত্ত্বেও খোদাভীতির সঞ্চার না হওয়া।

প্রাপক–
মুহাম্মদ আকবর সাহেব,
ডাহকশোরাকা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ১৪

৮ডিসেম্বর,৬২

মুহতারামী ও মুকাররমী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। ইতিহাস হযরত আদমকে (আঃ) পাঁচ হাজার বছর পূর্বের লোক বলছে– এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। অথচ ছয় হাজার বছর পূর্বেকার মিশর ও ব্যাবিলনের ইতিহাস বর্তমান রয়েছে। ইতিহাস শুধুমাত্র হযরত আদম (আঃ)

সম্পর্কেই নয় বরং নূহের (আঃ) তুফান সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত কোনো সাক্ষ্য যোগাড় করতে পারেনি।

প্রাপক–
এস, এম, ইলিয়াস
মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ১৫

২৪ ডিসেম্বর '৬২

মুহতারমী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। বর্তমানে শিক্ষা নীতিতে কোন সংশোধনীর প্রয়োজন, তা আমি বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছি। কিন্তু এ নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী একটি ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠার পথে অনেকগুলো বাস্তব অসুবিধা ও বাধা বিপত্তি আছে, যেগুলোর সমাধান করার শক্তি মোটেই আমাদের নেই।

জামায়াতে ইসলামীতে অনেক আলেম শরীক আছেন। স্বয়ং জামায়াতের মজলিসে সূরায় অর্ধসংখ্যক সদস্য আলেম। এ কারণে আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে, আমরা আলেমদেরকে সাথে রাখি না এবং আমরা আলেমদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছি। অবশ্য আলেমদের এক শ্রেণী থেকে আমরা সত্যিই নিরাশ হয়ে গেছি, যারা অজ্ঞতাসারে মিথ্যা দোষারোপ করে বেড়ায় এবং আমাদের সাথে এমন আচরণ করে যা অন্যের বিরোধী আলেমগণ কখনো কখনো তাদের সাথে করে থাকে।

আমি আমার ছেলেদের যে কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষা দিচ্ছি তা হচ্ছে, তাদেরকে বর্তমান পরিবেশ থেকে জোর–পূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবেনা। বরং ক্রমান্বয়ে তাদের মন–মেজাজ ও রুচিকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যাতে তারা নিজেরাই পরিবেশ ও পরিস্থিতির দোষ ত্রুটি বুঝতে পারে। চাপের মুখে নয় বরং নিজেই নিজের মতামতের ভিত্তিতে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকবে।

প্রাপক–
মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব,
নীলাগম্বজ, লাহোর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১৬

২৮ ডিসেম্বর '৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। মৃত্যুর পর মানবাত্মা জীবিত থাকে। তাতে পূর্ণ চেতনা বিদ্যমান থাকে। নেকার লোক কিয়ামত পর্যন্ত সরকারী অতিথির (State Guest) মর্যাদায় থাকে। আর বদকার লোকেরা থাকে বিচারাধীন কয়েদী হিসেবে। (under trial prisoner)

প্রাপক –
কেপ্টেন খাদেম হোসেন খান,
কোয়েটা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ১৭

২২ জানুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। ইসলামের নামে এ দেশে যে মিশ্র তর্ক–বাহাস চলছে ত আমার মতে পাকিস্তান গড়ার কোনো উপকারী ও ফলপ্রসু প্রোগ্রাম তৈরী করতে দেবে না। বিভিন্ন লোক ইসলামের একটি নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করে নিয়েছে। ইসলামকে পাকিস্তানের মৌলিক জীবনীশক্তি স্বীকার করার পর নিজেদের যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা তারা করছে। এভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধর্মভিত্তিক হবে, নাকি ধর্মহীন হবে এ নিয়ে প্রথমতঃ যে মতভেদ দেখা দেয় তা এবার অন্যরূপ ধারণ করেছে। এরূপ মতপার্থক্যের উপস্থিতিতে কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তা বাস্তবায়িত করা খুবই দুষ্কর। এখন এ পরস্পর বিরোধী তর্ক–বাহাসের অবসান হওয়া প্রয়োজন। এবং সর্বজন পরিচিত মতাদর্শের ভিত্তিতে দেশে আন্দোলন ও দল গঠন হওয়া প্রয়োজন। পরস্পর বিরোধী তর্ক –বাহাসকারী যেসব দল থাকবে তাদের দ্বারা দেশ গড়ার কাজ করা সম্ভব নয়। যারা ধর্মনিরপেক্ষতার (Seculerism) ধ্বজাধারী তাদেরকে নিজেদের দৃষ্টিভংগী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং ইসলামের নামে ধোঁকাবাজি ছাড়তে হবে। তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে লোকদেরকে ডাকতে হবে। যারা তাদের এ ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকেই তারা নিজের পার্শ্বে একত্রিত করবে। এমনিভাবে যেসব দল সমগ্র

মুসলমানদের প্রকৃত ইসলাম থেকে পৃথক নিজস্ব নিজস্ব ইসলামের কথা বলে না, তাদের পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে, তারা আল্লাহ'র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও উম্মতের ইজমাকে স্বীকার করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির শিক্ষাকে হেদায়াতের উৎস ও শরীয়তের বুনিয়াদ হিসেবে মানে না। তাদের পরিমণ্ডলে এমন লোকদের অবস্থানের কোনোই অবকাশ থাকবে না যারা এ বিশ্বাস পোষণ করে না। শেষোক্ত দলগুলোর সমন্বয়ে যদি একটিমাত্র দল করা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ ঐক্য হওয়া উচিত। এবং তারা একে অপরকে সহযোগিতা করা উচিত। কোনো কোনো বিষয় এমনও হয়ে থাকে যা দেশবাসীর সম্মিলিত উপকারিতার সাথে সম্পর্কিত। এ ধরনের বিশেষ বিষয়ে পূর্বোল্লেখিত তিনটি দলই কোনো সমঝোতার ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থায় যে সমঝোতাই হোক না কেন তা সুস্পষ্ট বুনিয়াদের ওপর হতে হবে এবং এটা পরিষ্কার থাকতে হবে যে, সম্মিলিত কাজটি কোন উদ্দেশ্যে কোন সীমা পর্যন্ত।

প্রাপক—
মাওলানা আব্দুস সাত্তার খান নিয়াজী সাহেব।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ১৮

৫ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। যদি কোনো সম্মেলনে ফটোগ্রাফার স্বেচ্ছায় এসে নিজেই সমস্ত কার্যাবলীর ফটো তোলা শুরু করে দেয় তবে আমি কি করতে পারি। আপনি কি চান যে, তাদের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হোক। একটি জামায়াতের লোকেরা তাদের সাথে ঝগড়া করে দেখেছে, এমনকি ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের সাথে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু তা-সত্ত্বেও তাদের সকলের ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। এখন তারাও হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এ ফেতনার যুগে একদিকে পূর্বের বন্যা আমাদের জন্যে আযাব হয়ে আছে। অপরদিকে পশ্চাত দিক থেকে আপনারা আমাদেরকে কোণঠাসা করছেন। বিগত দিনগুলোতে সংবাদপত্রে আমার ছবি ছাপা থাকতো আর প্রত্যেক ছাপানো ছবির অভিযোগে আমার কাছে চিঠি পত্র আসতে থাকলো। অত্যন্ত জরুরী কাজের ব্যাঘাত

করে এসব চিঠির জবাব আমাকে লিখতে হবে। অবশেষে লোকেরা এ কথাটা কেন বুঝতে পারছেনা যে, কোথাও জনসভার ঘোষণা হলে সেখানে আসার জন্যে কাউকে বাধা দেয়া যায় না। এমন জায়গায় ফটোগ্রাফার বিনা আমন্ত্রণে পৌঁছে যায়, বিনানুমতিতে নিজের কাজ তারা করে। আমরা তাদের সাথে ঝগড়া করেও দেখেছি কিন্তু তাদেরকে তাদের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি বরং এ অবস্থায় তারা আরো বেশী ক্ষেপে যায়।

নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেও কাবাকে গিলাফ পরানো হতো। রাসূলও গিলাফ পরিয়েছেন। পরবর্তী সমস্ত খলিফাদের যামানায় গিলাফ দেয়া হয়। এর জায়েয হওয়া সম্পর্কে আজ পর্যন্ত তো কেউ কথা তোলেনি। আপনার কাছেই এর প্রথম প্রতিবাদ শ্রবণ করলাম। বড় বড় আলেমগণ মক্কা মুয়াজ্জমা ও দু'হারামের (মক্কা ও মদীনা) যে ইতিহাস রচনা করেছেন সেগুলো প্রথমত, পাঠ করুন। এটা তো এমন একটি জটিল বিষয় যে, নবীদের চরম গোড়াপন্থী 'ওহাবী' আলেমাগণও কখনো এর ওপর অভিযোগ করেনি।

প্রাপক–
মাওলানা সায়াদ উদ্দীন সাহেব,
মর্দান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১৯

৫ ফেব্রুয়ারী,৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। মসজিদ তৈরীর কাজে কেউ চাদা দিলে তা গ্রহণ করতে দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যবসায়ের জন্যে বরকতের দোয়া করতে হলে দেখতে হবে যে তার কারবারটি বৈধ প্রকৃতির কিনা; সার্কাসের আয় হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে যে, যে বিশেষ ব্যক্তির সার্কাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সেখানে কি কি কাজ হয়ে থাকে। যদি সুস্পষ্ট হারাম কাজ হয়ে থাকে তবে মসজিদের জন্যে তার টাকা গ্রহণ করা মকরূহ তো অবশ্যই।

প্রাপক–
মুহাম্মদ সলীম সাহেব,
লাড়ে, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—২০

৫ ফেব্রুয়ারী,৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। এ কথায় আলেমগণ প্রায় একমত যে, 'খবরেওয়াহেদ' দ্বারা শরীয়তের হুকুম প্রমাণিত হয়। কিন্তু আকায়িদ প্রমাণিত হয় না। আকায়িদ 'কুরআন' ও 'মুতাওয়াতের হাদীস' দ্বারা প্রমাণিত হওয়া জরুরী। আপনি যেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে আমি এ কথাই লিখেছি। ফেতনাবাজ লোকেরা যদি জেনে – শুনেই এর মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করে তবে তাদেরকে তাই করতে দিন। আমি যতোই সাবধানতা সহকারে লেখি না কেন ছিদ্রান্বেষণের জন্যে যারা কোমর বেঁধে বসে আছে তারা নিজেদের মতলব সেখান থেকে বের করবেই। এসব লোকের প্রতিশেধক এটা নয় যে, তাদের আপত্তি ও অভিযোগ দেখে কেউ নিজের বাক্য পরিবর্তন করে নেবে। বরং তাদের ওষুধ এটাই যে, মানুষ তার নিজের কাজ করে যাবে এবং তাদেরকে কথা বানানোর সুযোগ দেবে।

প্রাপক–
মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব
ঠন্দু, (জিকবাবাদ)

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—২১

৫ ফেব্রুয়ারী ৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। সৌদি দূতাবাসের লোকেরা আপনার প্রস্তাব (offer) এ কারণে গ্রহণ করতে আপত্তি করছে যে, মসজিদে নববী ও মসজিদুল হারামে যতো পাখার প্রয়োজন ছিল তা আগেই লাগানো হয়ে গেছে। এখন পাখা লাগানোর মত কোনো জায়গা খালি নেই। আপনি মক্কা মদীনায় পাখা পাঠানোর জন্যে এতো ব্যতিব্যস্ত কেন? পাকিস্তানের অনেক মসজিদে পাখার প্রয়োজন। সব মসজিদে লাগিয়ে দিন।

প্রাপক–
জনাব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ওকেশিয়া লিমিটেড, লাহোর,

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—২২

৭ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। যদি আপনি নিজের অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইউরোপে যাওয়া লাভজনক মনে করেন তবে সেখানে যাওয়াতে কোনো শরিয়তী দোষ নেই। এখন তো অন্ততঃ লন্ডনে একজন লোক কোনো হারাম জিনিস ব্যবহার না করেও থাকতে পারে। পরন্তু সেখানে গিয়ে নিজের অবস্থানকে দ্বীনের জন্যেও লাভজনক বানাতে পারে।

পাঠ্য বিষয় আইন কিংবা হিসাব শাস্ত্র যা-ই হোক না কেন; তা অবশ্যই উপকারী হবে এবং ইসলামী সমাজের জন্যে তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এখন এটা আপনার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল যে কোনো বিষয়ে পড়ালেখা করে তদ্বারা শুধুমাত্র জায়েয কাজ করতে এবং নাজায়েয কাজের সুযোগ থেকে বেঁচে থাকতেপারবেন।

প্রাপক-
শামীম আহমদ ছিদ্দীকি সাহেব,
পি, এ, এফ, সারগোদা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—২৩

৭ই ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি যেসব আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর জবাব দেয়াকে আমি সময়ের অপচয় মনে করি। নিজ দলের লোক ছাড়া অন্য সব লোকদের বেদীন আখ্যায়িত করাই তাদের কাজ। আমরা দশটি অভিযোগের জবাব দিলে তো তারা আরো বিশটি অভিযোগ উত্থাপন করে নেবে। সুতরাং এর প্রতিকার হলো, তাদের কথার প্রতি কর্ণপাত না করা। আর যাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাদেরকে বলতে হবে যে, বিরুদ্ধবাদীরা যেসব বাক্যের স্বীকৃতি দেয় সেগুলোর বেশ

তারা আমাদের মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখে। অথবা আপনার কাছে মূল বই থাকলে আপনিই তাদের মিলিয়ে দেখিয়ে দেবেন।

প্রাপক–
জিন্দাহ খান
শুকর, দূরময়, জিলা-কোহাট।

খাকসার,
আবুলআ'লা

পত্র—২৪

৬ ফেব্রুয়ারী ৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। গিলাফে কা'বা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভংগী ঠিক নয়। যেসব কাজ হজ্জ ও বাইতুল্লার সাথে সম্পর্কিত কুরআন সেগুলোকে আল্লার নিদর্শন (শায়ার) বলে ঘোষণা করেছে এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছে। এগুলোকে সম্মান করা তাকওয়ার পরিচয়। অসম্মান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কা'বার উদ্দেশ্যে গমনকারী একটি কুরবাণীর উটকে এমন কি তার গলায় ঝুলানো জুতার মালার প্রতিও সম্মান প্রদর্শনের হুকুম এসেছে। অথচ এ পশুটি এখন পর্যন্ত হারাম শরীফ পর্যন্ত পৌঁছেনি। এ কারণে আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে যে গিলাফটি এখনো কাবার গায়ে উঠেনি সেটা সম্মানের উপযুক্ত নয়। গিলাফটি তো আল্লার ঘরে টাঙ্গানোর জন্যেই বানানো হয়েছে। এমনিভাবে আপনি যে গিলাফে কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে আপনি 'অর্চণা' সাব্যস্থ করেছেন তাও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে পূজা শব্দটি প্রযোজ্য হয় না বরং এটা আল্লার নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আওতায় পড়ে, যা নাকি প্রশংসাযোগ্য কাজ বলে কুরআনে উল্লেখ আছে। ইনশাআল্লাহ! আমি এ বিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করবো যাতে আল্লাহ'র নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কাজটি সীমাতিক্রম করে পূজার পর্যায়ে এসে না পৌছে। আমি সৌদি সরকারের কাছে গিলাফকে 'চুমো দেয়া' ও 'পূজা' করার কথা উল্লেখ করে দরখাস্ত করিনি। শুধু এটা বলেছি যে, গিলাফটি যেন গাড়ী দিয়ে পাঠানো হয় যাতে প্রত্যেক ষ্টেশনে লোকেরা এর যিয়ারত করতে পারে। [১]

প্রাপক–
ক্যাপেটন
মুঃ শরীফ খান,
শামিস আজাদ কলোণী, মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

---

১. "মিশরের সাথে মনকষা–কষির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান এ সৌভাগ্য লাভ করে।

পত্র—২৫

১৯ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। গিলাফটি আমাদের তত্ত্বাবধানে তৈরী হচ্ছে এ কথা কেউ জেনে ফেলুক এমন কোনো প্রচেষ্টা আমাদের প্রথম থেকেই ছিল না। এ কথা যেনো প্রকাশ ও প্রচার না হতে পারে, সেজন্যে আমি শক্তভাবে বাধা দিচ্ছিলাম। কিন্তু সংবাদপত্রগুলো কোনো সূত্রে ব্যাপারটা জেনে তা প্রকাশ করে দেয়। এরপর সংবাদপত্রগুলো নিজেরাই এর খোঁজ-খবর নিতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশ করতে থাকে। এতে লোকের অতৃপ্ত মনে গিলাফটি দেখার প্রবল আকাংখা জাগে। যে কারখানায় গিলাফটি তৈরী হচ্ছিল সে কারখানায় লোকের ভিড় শুরু হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে এটা দেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়, অন্যথায় আমাদের ও কারখানার জন্যে কাজ করা অসম্ভব হতো। এ ব্যবস্থাও লাহোরবাসীর সাধারণ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে করতে হয়েছে যে, গিলাফটিকে রাজকীয় মর্যাদায় পাঠাতে হবে। যদি আমরা নিজেরা এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ভুল পথে যেতে বাধা না দিতাম তবে গিলাফটি যাওয়ার সময় জনগণের সমাগম এমনিতেই একটি বিশৃংখল সমাবেশের রূপ ধারণ করত এবং কত অজানা নিষিদ্ধ কাজ এর সাথে প্রকাশ পেতো। কারখানায় সব সময় হাজারো লোকের ভিড় লেগেই আছে। পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। জনসাধারণের কাছে এ কথা গোপন রাখা যাবে না যে, গিলাফটি কখন রওয়ানা করছে।

প্রাপক-

মাওলানা গাওহার রহমান,
মর্দান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

১৯৬৩ সনে গিলাফে কা'বা এখানে তৈরী হয়। সৌদি সরকার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর তত্ত্বাবধানে নিজ খরচে এ পবিত্র কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। গিলাফটি তৈরী হওয়ার পর সর্ব সাধারণের যিয়ারতের সুযোগ দান করতে লোকেরা বাধ্য করলো। সুতরাং সে ব্যবস্থা করা হয়। এটা 'বিদায়াত' বলে দেশে একটি শোরগোল উঠে। অথচ এর আগে ১৩৪৬ হিঃ সনে গিলাফে কা'বা হিন্দুস্তানে তৈরী হয়। অমৃতসরের মাওলানা ইসমাইল গজনভীর ঘরে গিলাফে কা'বার যিয়ারত করানো হয়। মওলানা আবদুল ওয়াহেদ গামানী কাসুর থেকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেন। অমৃতসরের সংবাদপত্র তাওহীদে ৪ঠা জিলকদ ১৩৪৬ হিঃ তারিখের সংখ্যায় বর্ণনা করা হয় যে, দ্বিপ্রহরের পর এশা পর্যন্ত যিয়ারতকারীদের মিছিল আসছিল এবং অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ এ সময়ে গিলাফ যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করে। আশ্চার্য যে, সে সময় এ যিয়ারতকে কেউ বিদায়াত বলেনি"। (সম্পাদক)

পত্র—২৬

৬ এপ্রিল '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাবার গিলাফকে কেন্দ্র করে আমার ওপর ও জামায়াতে ইসলামীর ওপর যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে এর বিস্তারিত আলোচনা করবো তর্জুমানুল কুরআনের আগামী সংখ্যায় ১। আপনি পুরা আলোচনাটি দেখে নিলে সেটাইতো ভালো হতো। কিন্তু যদি আপনি তাড়াহুড়া করেন তাহলে আমি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ইংগিত দিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমতঃ যে মৌলিক ভুলের ওপর অভিযোগের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে তা হলো আমার সম্পর্কে ধরে নেয়া হয়েছে যে, আমি নিজেই গিলাফটি প্রদর্শনের এন্তেজাম করেছি; সমাবেশের প্রোগ্রাম করেছি এবং ট্রেনে প্রদর্শনের পরিকল্পনা তৈরী করেছি। অথচ প্রকৃত ঘটনা এটা নয়। আসল ঘটনা এই যে, গিলাফ তৈরীর ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণ গোপনে করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সংবাদপত্রগুলো বিষয়টি জেনে ফেলে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে তারা বিষয়টি প্রকাশ করে।

জনগণ যখন এ খবর পেলো তখন তাদের মধ্যে গিলাফের আকর্ষণ এবং তা দেখার প্রবল ইচ্ছা এমন এক বন্যার আকারে বাড়তে থাকলো যা আমরা কখনো আশা করিনি। এ অবস্থা দর্শনে আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ঝড় থামানো আমাদের আয়ত্ব বহির্ভূত। যে কারখানায় গিলাফটি তৈরী হচ্ছিল সে কারখানার ঠিকানা জনগণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনে নেয়। মানুষের ভিড় জমতে শুরু হয়। আমাদের বাধাকে উপেক্ষা করে লোকেরা ফেক্টরী থেকে কতোনা উপায়ে গিলাফের কাপড় সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র লাহোরের স্থানে স্থানেই এর যিয়ারত হচ্ছে না; বরঞ্চ আমাদের কাছে খবর আসতে থাকে যে, আজকে গিলাফ অমুক স্থানে পৌঁছে গেছে এবং সেখানে তা দেখার জন্যে জনতার মিছিল নামে। কিংবা হাজার হাজার মানুষ গেলাফটি যিয়ারত করছে। গিলাফের কাপড়টি গোপনভাবে কারখানা থেকে বের করে চুপিসারে করাচী কিংবা মক্কা শরীফ পাঠিয়ে দেয়া আমাদের জন্যে কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, জনসাধারণের এ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণকে ভুল পথে যেতে বাধা দেয়া এবং সঠিক পথে

---

১. তর্জুমানুল কুরআনের মার্চ ১৯৬৩ সংখ্যায় এ আলোচনা প্রকাশ করা হয়। (সংকলক)।

পরিচালনার চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা এরূপ না করি তবে মানুষের আকর্ষণ এমন পন্থা গ্রহণ করবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অধিক অভিযোগের কারণ হবে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা লাহোর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করি। কমিটি সুশৃংখলভাবে লোকদেরকে গিলাফ দেখাবে। তারপর বাঁধা নিয়মে জুলুস আকারে এর রওয়ানা (এর সাথে আমরা অন্যান্য শহরের জন্যেও স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করি) হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যাতে অনিয়মিত ভাবে গিলাফের কাপড় বাইরে যাওয়ার ধারা বন্ধ হয়ে যায়, লাহোরের কমিটি চার দিন মেয়েদের এবং তিন দিন পুরুষদের দেখানোর জন্যে নির্দিষ্ট করে এবং এ কথার ওপর সতর্ক থাকে যে, মেয়েদের দেখানোর বেলায় শুধুমাত্র শিক্ষিতা মেয়েরাই থাকবে। আর পুরুষদের বেলায় কর্মকর্তাগণ পুরুষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। লোকদেরকে শেরেকী কাজ থেকে বিরত রেখে যিকর ও দরুদ শরিফের শিক্ষা দিবে।

এভাবে যেসব স্পেশাল ট্রেন বাইরে পাঠানো হবে সেগুলোর সাথেও কতিপয় কর্মকর্তা পাঠানো হয়। তাদেরকে বলে দেয়া হয় যে, প্রত্যেক ষ্টেশনে পৌঁছেই, আল্লাহু আকবার ও কলেমায়ে তাইয়্যেবাহ্ লাউড স্পীকারে পড়া শুরু করবে। তাতে লোকেরা নিজে নিজেই আল্লাহর যিকরের প্রতি উৎসাহী হয়ে যাবে। আধিকন্তু পুরুষ ও নারীদের গিলাফ দেখনোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে করতে হবে। নারী পুরুষের মাঝে গোলযোগ যেনো না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। লোকদেরকে গিলাফের তথ্য সম্পর্কে অভিহিত করে শেরেকী কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। গিলাফটি রওয়ানা হওয়ার সময় লাহোরে জুলুসের যে প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়েছে সেখানেও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, আল্লাহর যিকর এতো বুলন্দ আওয়াযে করা হবে যাতে অন্যান্য আওয়ায বুলন্দ হওয়ার অবকাশ না পায়। পরন্তু বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, মেয়েরা যেন সমাবেশে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

এতে এ সত্য উদঘাটিত হয় যে, এটা এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না যা লোকের মধ্যে দ্বীনি জযবা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আমরা নিজেরাই এটা করেছি। বরং প্রকৃতপক্ষে এ পদক্ষেপ আমরা তখনই গ্রহণ করি যখন লোকের মধ্যে একটি জযবা স্বতঃই উদ্বেলিত হয়ে উঠে। এ পরিকল্পনা তৈরী করার আসল উদ্দেশ্য হলো—এ দুর্বার আকর্ষণকে গর্হিত কাজ থেকে বিরত রেখে যিকরুল্লাহ'র প্রতি মোড় দেয়ার জন্যে যতোটুকু করা সম্ভব তা করা। যদি আমরা এরূপ না করতাম তবে জনতা আরো অধিক গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়তো এবং কারো বাধা মানতোনা।

এবার আমি আপনাকে সংক্ষেপে একথাও বলবো যে, প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল আর কোনো কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় এটাকে কি রূপ দিয়েছেন।

লাহোরের জুলুস আমি নিজে দেখেছি। এবং শেষ সময় পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। বিমান বন্দর পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে ৬/৭ লাখ লোকের সমাগম হয়ে যায়। দীর্ঘ আট মাইল রাস্তা ছিল। এ গণমিছিল অতিক্রমের রাস্তায় সিনেমার এবং দোকানের সমস্ত অশ্লীল নারী মূর্তি অপসারিত করা হয় অথবা লুকনো হয়। রেডিওতে গানের আওয়ায বন্ধ করা হয়। পুরা মিছিল লা-ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এবং আল্লাহ আকবার যিকরে তন্ময় ছিল। কোনো কোনো সম্প্রদায় অন্যান্য আওয়ায বুলন্দ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ছিল। কিন্তু ২/৪ বার তাদের চিৎকারে আওয়ায উঠেছিল। কিন্তু পুনরায় সমগ্র সমাবেশ কালেমায়ে তাইয়্যেবা ওজিফায় তন্ময় হয়ে যায়। পরিষ্কার বুঝা গেল যে, লোকেরা সেসময় কালেমায় তাইয়্যেবা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে তৈরী নয়। এতো বড় মহাসমারোহে একটি পকেট মারা হয়নি। গুন্ডাবাজির কোনো ঘটনা ঘটেনি। সেদিন সমগ্র শহরে নেকীর এমন প্রচন্ড প্রভাব ছিল যে, জুতা, মালামাল সমাবেশের চাপে রয়ে গেছে; কয়েক ঘন্টা পর বিমান বন্দর থেকে ফিরে এসে জুতা ও মালামাল অক্ষত অবস্থায় পরিত্যক্ত পাওয়া গেছে। এতো বড় কল্যাণে যদি কোনো শেরেকী কিংবা বেদআতী কথা হয়ে যায় তবে তা আমাদের মৌলভী সাহেবদের পাকড়াওতে ধরা পড়তে পারে। অথচ যেখানে লাখো মানুষের সমাগম সেখানে কতিপয় লোকের শেরেকী কথা কিভাবে বাধা দেয়া যায়। চলতি সমাবেশ থেকে যদি কিছুলোক হঠাৎ গিলাফকে চুমু দিয়ে দেয় অথবা কিছুলোক আপত্তিকর শ্লোগান দেয় তবে কি শুধু এ কারণে এ মহান কল্যাণকর কাজটি স্থগিত রাখতে হবে, যা সেদিন লাহোরে এতো বড় মর্যাদাসহ প্রকাশ পেয়েছিল? এটা তো ঠিক মাছির মতো, সমস্ত পবিত্র জিনিস ছেড়ে সে কেবল দু'গন্ধময় বস্তুরই তালাশে থাকে এবং কোথাও সামান্য ছিটেফোটা পেলে সেখানেই বসে পড়ে।

যেসব স্পেশাল ট্রেন বাইরে পাঠানো হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত রিপোর্ট আমি সংগ্রহ করেছি। কেবলমাত্র জামায়াতের কর্মীদের কাছেই নয় বরং যেসব সিভিল ডিফেন্স ও স্কাউট ট্রেনের সাথে ছিল তাদের কাছ থেকেও রিপোর্ট নিয়েছি। তাদের সকলের বর্ণনা হলো – স্থানে স্থানে গিলাফ দেখার উদ্দেশ্যে লাখো লোকের সমাগম হয়। প্রত্যেক স্থানে যিকরে ইলাহীর আওয়াযই বুলন্দ ছিল। অন্যান্য আওয়ায কদাচিত হয়ে থাকবে। প্রত্যেক জায়গায় পুরুষ ও স্ত্রীদের সমাবেশ আলাদা ছিল। অধিক ভিড়ের দরুন স্ত্রী–পুরুষদের সংমিশ্রণের অবকাশ খুব কম জায়গায় হয়েছে। প্রত্যেক স্থানে শান্তি ও সুশৃংখলার সাথে যিয়ারত হয় এবং খুব কম জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। সতর্কতার কারণে নয় বরং প্রচন্ড ভিড়ের কারণে অনেক মেয়েরা আসে কিন্তু তাদেরকে উত্যক্ত করেছে এমন ঘটনা কদাচিত কোথাও হয়নি। এতো বড় মহাসমারোহে কারো পকেট মারার ঘটনা শুনা যায়নি। জনগণকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেক ও কল্যাণের শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদেরকে গিলাফ যিয়ারতের

শর্তাবলী বুঝানো হয়। জনগণ সাধারণভাবে এ শর্ত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং অধিকাংশকে এ দোয়া করতে দেখা গেছে যে, হে আল্লাহ! যে ঘরের গিলাফ লেখার তৌফিক তুমি দিয়েছো সে ঘরখানি বিয়ারত করার তৌফিক তুমি আমায় দাও। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি কোনো লোক গিলাফকে অথবা ট্রেনকে চুমু দেয় অথবা কেউ ট্রেনের ইঞ্জিনকে ইঞ্জিন শরিক বলে অথবা কর্মীদের বাধাদান সত্ত্বেও গিলাফের ট্রেনে পয়সা ছুঁড়ে মারে অথবা প্রচন্ড ভীড়ের দরুন স্ত্রী–পুরুষদের শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব না হয়ে থাকে তবে এ কতিপয় ঘটনাকে আমাদের 'দীনদার' লোকেরা আপত্তির উৎস বানিয়ে নিয়েছেন এবং ওসমস্ত কল্যাণকর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন যা একাজে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রূপে পাওয়া গেল।

অতঃপর ঐ হুজুরগণ কেবলমাত্র কীট পতংগ বের করেই ক্ষান্ত হননি। বরং যেখানে কীটের সন্ধান পাননি সেখানে নিজেদের পক্ষ থেকে কীট পতংগ সৃষ্টি করতে এতোটুকু দ্বিধা করেনি। যেমন লাহোরে আমাদের বিনানুমতি ও অজ্ঞাতসারে কাছুরপুরের লোক (যাদের এলাকায় গিলাফ তৈরীর কারখানা) নিজেরাই গিলাফের জুলুস বের করে এবং গিলাফ নিয়ে বাদশাহী মসজিদে পৌছে। এখানেই গিলাফ দেখানোর ব্যবস্থা এন্তেজামিয়া কমিটি কর্তৃক করা হয়। এ জুলুস সম্পর্কে বড় বড় দীনদার লোক এ অপবাদ দিয়েছে যে, জুলুসের আগে ব্যান্ড পার্টি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। তারা আরো মিথ্যারোপ করে যে, ঐ জুলুস গিলাফটিকে হযরত আলী হাজভেরীর(রঃ) মাঝারে বিছায়। অথচ এ উভয় কথা সার্বৈব মিথ্যা। সম্ভবতঃ ঘটনা এই যে, এ জুলুস রাস্তা অতিক্রমকালে ঘটনাচক্রে একটি বরযাত্রী এসে যায় যাদের হাতে বাদ্যযন্ত্র ছিল। এ কথা খলিল হামিদী সাহেব আমাকে বলেছেন। কিন্তু এক্ষণি ইয়াকুব আনছারী সাহেব (যারা গিলাফ তৈরী করেন) আমার কাছে আসলে আমি তাকে এ ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, কেননা তিনি স্বয়ং এ জুলুসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : প্রথমত এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই যে, মাজারে হযরত হাজভেরীর (রঃ) মাঝার সে রাস্তা দিয়ে জুলুস শুধু অতিক্রান্ত হয়। এ জুলুসের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং আমাদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লোকেরা জুলুস বের করে। আমরা এ কারণে বাধা দিতে পারিনে যে, যে এলাকায় কারখানাটি অবস্থিত সেখানকার লোকদেরকে তাড়িয়ে গিলাফ বের করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

এটাও একটি আশ্চর্য কথা যে, ঐসব হুজুরদের মাথা ব্যথা কেবলমাত্র লাহোরে তৈরী গিলাফ নিয়ে। করাচীর গিলাফ করাচীতেও প্রদর্শিত হয়েছে এবং ট্রেনেও। কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে ঐ মহলের কোনো আহাজারী নেই। বরং যেসব কথা–বার্তা ঐ গিলাফ সম্পর্কে হয়েছে সেগুলোর সম্পূর্ণ দায়–দায়িত্বেও আমার এবং জামায়াতে ইসলামীর ওপর আরোপ করা হয়েছে।

এটা তো ভাল যে, আপাততঃ দৃষ্টিতে যেসব মোয়ামেলা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এসব কথা-বার্তা। কিন্তু আমাদের ওসব উমদারগণের দৃষ্টি মাশাল্লাহ্ বাতেন পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। তারা এটাও জ্ঞাত হয়েছেন যে, গিলাফ প্রদর্শনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আমি এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছি যাতে আমার প্রচার প্রসার হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং এর মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভ করি। আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমার এ নিয়ত তাদের কাছে কিভাবে প্রকাশ পেল। যদি তারা মনের খবর জানেন বলে দাবী করেন, তবে তা হবে শির্ক ও বিদয়াদ থেকে অধিকতর জঘন্য, যার জন্যে তারা চার্জ করে থাকে। আর যদি তারা এ নিয়ত কে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে আমার প্রতি সম্বোধন করে থাকেন তবে তারা হয়তো বা কুরআন হাদীসে শুধুমাত্র শির্ক ও বিদয়াতের দোষগুলো পেয়ে থাকবে। অপবাদ ও মিথ্যারোপের হুকুম তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, আমার দৃষ্টিতে কা'বার গিলাফের যিয়ারত এবং এর জুলুসের কোনো স্বতন্ত্র রসম তৈরী করা কক্ষণো নয়। যা কিছু করা হয়েছে উপরোল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে বাধ্য হয়ে।

ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তানে গিলাফ তৈরীর দায়িত্ব আমার মাধ্যমে হওয়ার অবকাশ হয় তবে আমি যথাসম্ভব চুপিসারে বানানোর চেষ্টা করব। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন যে, যে কাজ আমার একার নয় বরং অনেক কারিগরের সহায়তায় করতে হয়, সে কাজ গোপন রাখা খুবই দুষ্কর। [১]

প্রাপক -
মাহের আল কাদিরী সাহব,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ২৭

২৭জুন, '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আমার ব্যবস্থাপনায় এখানে যে গিলাফটি তৈরী হয়েছে তা সৌদী সরকার একেবারে গ্রহণ না করার কথা সম্পূর্ণ ভুল। ঘটনা হলো—এ বছর হজ্বের সময় যে গিলাফটি কা'বা ঘরে চড়ানো হয় তাতে লাহোরে তৈরী কাপড়ই

১. 'গিলাফে কা'বার প্রদর্শন ও এর জুলুস' শিরোণামে রাসায়েল ও মাসায়েলের ৪র্থ খণ্ডেও একটি প্রশ্নোত্তর আছে। গিলাফে কাবার তারিখ এবং এর শারয়ী মর্যাদা নামে মাওলানার বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়।

(সংকলক)

বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। ভারতে তৈরী কিছু কাপড়ও লাগানো হয়। আমি নিজে সৌদী সরকারের হজ্জ মন্ত্রীর সাথে গিলাফের কারখানায় গিয়ে এ কাপড়গুলোই জুড়তে দেখলাম। এখন ঘরে বসে যারা গিলাপ প্রত্যাখ্যান করার গল্প বানিয়ে ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের এ মিথ্যার প্রতিশেধক পরিশেষে কি হতে পারে?

প্রাপক-
পীর মুহাম্মদ আবু ওমর
বোম্বাই বাজার, করাচী।

খাকসার,
আবুলআ'লা

পত্র— ২৮

৮ অক্টোবর, ৬২

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাবা'র গিলাফ সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি তাতে আমার দৃষ্টিভংগী তর্জুমানুল কুরআনে (মার্চ '৬৩) সবিস্তারে আলোচনা করেছি। আমার দৃষ্টিভংগী এখনো সেটাই আছে। আমার দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের জন্যে এমন কোনো যথেষ্ট মূল্যবান দলিল আজও আমার সামনে আসেনি। রইলো লোকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ। এগুলো সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞাত এবং ভালো করে এগুলোর ওপর চিন্তা করেছি। এগুলোর অধিকাংশের উদ্দেশ্য সৎ নয়, ভালো উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগের সংখ্যা খুবই কম। তারা ব্যাপারটি ভালো করে বুঝতে পারেনি। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আমি অভিযোগকারীদের দৃষ্টিভংগীকে ভুল মনে করি এবং নিছক ইজ্জতের খাতিরে কারো তুষামুদ করতে তৈরী নই। তবে যদি কোনো যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ আমার কাজকে সত্যিই ভুল বলে নিশ্চয়তা দিতে পারে তা হলে ঘোষণা দিয়ে ভুল স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকবে না।

দাঁড়ির ব্যাপারে আমাদের ধর্মীয় শ্রেণী গোষ্ঠী বড় বাড়াবাড়ি করছে। এ বাড়াবাড়ি এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ বাড়িবাড়িকে যদি আমি মেনে নেই তাহলে মৌলভী শ্রেণী সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে যাবে কিন্তু নব্যশিক্ষিত শ্রেণী বিদায় নিবে। যদি এ বাড়াবাড়ির ভিত্তি শরীয়তের বিধান হতো তাহলে নব্যশিক্ষিতের সকলেই একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও তা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতামনা।

একমুষ্টি পরিমিত দাঁড়ি রাখা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ওয়াযিব করেছেন এমন কথা প্রমাণিত নয়। এ পরিমাণ ওয়াযিব হওয়ার ওপর আলেমগণও একমত নয়। বড়জোর এ কথা বলা যায় যে, আলেমদের অধিকাংশই এমন ফায়সালা উদ্ভাবন করেছেন। বিষয়টিকে প্রথম ও প্রধান মর্যাদা দেয়া এবং এক মুষ্টি পরিমাণের কম শ্মশ্রুধারীকে অগ্রাহ্য করার কোনো দ্বীনি কারণ বাস্তবিকই আছে কি?

প্রাপক–
ফয়জুল্লাহ ফয়েজ সাহেব,
ডাডর (হাজারা)

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ২৯

১১ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। মির্জা সম্প্রদায়ের লোকেরা মুবাহিলাকে একটি তামাশায় পরিণত করেছে। কতিপয় মুসলমানও অন্ধানুকরণে মুবাহিলার চ্যালেঞ্জ দিতে শুরু করেছে। অথচ সমস্যা সমাধানের এটা কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নয়, যা সব সময় সহায়ক হতে পারে। বরং শুধুমাত্র একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা নবী আলাইহিস সালামকে নজরানের ঈসায়ী প্রতিনিধিকে মুবাহিলার আহবান করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ তায়ালা জানতেন প্রতিনিধি লোকগুলো মনের দিক থেকে রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে কিন্তু ইজ্জতের খাতিরে কুফরীকে আঁকাড়িয়ে আছে, আর এ কারণেই মুবাহিলার আহবান জানানো হয়।

প্রাপক–
মওলানা মনজুর আহমদ সাহেব,
চানিভোট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৩০

১৪ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পত্র পেয়েছি। আপনি তাফহীমুল কুরআনের তিনটি খণ্ডের সূচীপত্রের সাহায্যে আদমের (আঃ) কাহিনী বিবৃত সমস্ত স্থানগুলো বের করুন এবং এর উপর আমার

লেখা টীকাগুলো মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন। আশা করি এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন।

যে পরিকল্পনায় হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয় সে পরিকল্পনা মোতাবেক তাকে বেহেশত থেকে বের করা হয়। তবে যে পরীক্ষার পর তার বহিষ্কার ঘটে এবং এ ব্যাপারে শয়তান যে ভূমিকা পালন করে তাতে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ বেহেশতের উপযোগী হোক এটা শয়তানের কাম্য নয়। মানুষকে যখন বেহেশতে রাখা হয় তখনও শয়তান তাকে বেহেশত থেকে বের করতে চেষ্টা করে, এখনো সে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করতে না পারে। সূরায়ে আরাফে একথাই বলা হয়েছে।

খাকসার,
আবুল আ'লা

প্রাপক–
মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক সাহেব,
নিউটাউন, করাচী।

পত্র — ৩১

১৬ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। সব কিছু আল্লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে– আপনার এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক। তবে এটাও আল্লার মর্জি যে, মানুষ তার নিজের জীবিকা এবং প্রয়োজনীয়তার জন্যে সমস্ত সম্ভাব্য বৈধ কলা-কৌশল অবলম্বন করবে এবং নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। বৈধ প্রকৃতির প্রচেষ্টায় কোনো দোষ নেই। তবে অবৈধ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত। নিজের জীবিকার জন্য অপর মানুষের সাহায্য নেয়া স্বতই জায়েয। তবে সাহায্য যদি নাজায়েয শর্তাধীন হয় অথবা সাহায্য লাভের পরিণতি কোনো সময় অশুভ হওয়ার আশংকা থাকে তা হলে এমন সাহায্য বর্জন করা উচিত।

খাকসার,
আবুল আ'লা

প্রাপক–
রাও মুহাম্মদ আশফাক
ব্যারিষ্টার এট–ল, লাহোর।

পত্র — ৩২

১৬ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পত্র হস্তগত হয়েছে। পাঁচটি প্রশ্নাকারে আপনার বিস্তীর্ণ জিজ্ঞাসা পড়ার সময় আমার মনে হলো মানুষের পূর্ণ জীবনের কাজটি আমাকে করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সমগ্র বাস্তব সমস্যার সমাধান আমাকেই আঞ্জাম দিতে হবে। অথচ আমি কুরআনে বর্ণিত আখেরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীদের একজন মাত্র। কুরআনের ভাষ্য–মানুষ দুনিয়াতে যে দেহ নিয়ে কাজ–কারবার করেছে সে দেহসহ তাদেরকে পুণর্জীবিত করা হবে। আখেরাতে দেহের অংগ–প্রত্যংগ তার কাজের সাক্ষ্য দান করবে। এ জিনিসটিই আমি বর্ণনা করেছি। বিষয়টি যদি অপ্রচ্ছন্ন হয় তাহলে তাকে প্রচ্ছন্ন করতে কোনো ক্লেশ পেতে হবে না। কিন্তু যদি এর বিস্তারিত তত্ত্ব জানতে হয় তাহলে অবশ্যই এমন প্রশ্ন দেখা দিবে যার সমাধান মানবীয় জ্ঞান দিতে পারবেনা।

প্রাপক–
রশীদ আহমদ সাহেব,
ঝুমরা, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৩৩

২৮ ফেব্রুয়ারী '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। এর আগে আপনার অসুস্থতার কোনো খবরই আমার জানা ছিল না। ২১ ফেব্রুয়ারী আপনার পত্র পেয়ে জানলাম আপনি চল্লিশ দিন হাসপাতালে থেকে এসেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সুস্থতা দান করুন।

আপনার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদানে কোনো ফায়দা আছে বলে আমি মনে করি না। প্রকৃত মন্ত্রীত্ব তখনই হয়, যখন তার পিছে পার্লামেন্ট, দলীয় শক্তি থাকে এবং সে শক্তির বলে মন্ত্রী নিজের পলিসি নিজের ইচ্ছানুযায়ী তথা দলীয় মেন্ডেটের ভিত্তিতে তৈরী করতে পারেন। কিন্তু যেখানে অবস্থা এরূপ থাকে না, সেখানে মন্ত্রীত্ব একপ্রকার গোলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলতঃ এরূপ মন্ত্রীত্বে অপরের তৈরী করা

পলিসি চালানো এবং তাকে সমর্থন (defemd) করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এরূপ চাকুরী এমন কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না, যার মধ্যে আদর্শের সামান্য লেশ রয়েছে এবং যিনি দেশে নিজের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চান।

প্রাপক–
মিষ্টার আখতার উদ্দিন আহমদ
বার. এট–ল, ঢাকা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৩৪

২৮ ফেব্রুয়ারী, ৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আফসোস যে, এ অবস্থা একটিমাত্র দৈনিক পত্রিকার নয় বরং ইসলাম ও জাহেলিয়তের সংমিশ্রণ মুসলমানদের সাধারণ জীবনের সব দিকেই নজরে পড়ছে। এ অবস্থায় কারো বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজী করে তার নিন্দা করার পরিণতি এ হবে যে, পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির যৎকিঞ্চিৎ যা সহায়তা করছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবদিকে জাহেলিয়াতের প্রকাশ্য ও অবাধ প্রচারণাকারীরাই অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং ইসলামের সত্যিকার দরদী লোকদের উচিত, ফতওয়াবাজী করার পরিবর্তে জাহেলিয়ত এবং তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এমন অবিরত ও প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যাতে করে মুসলিম সমাজের প্রতিটি লোক এ পূতিগন্ধময় সংস্কৃতির প্রদর্শনী দেখে লজ্জায় মাথা হেট করে।

প্রাপক–
মালীক হানীফ ভিজদানী সাহেব,
মারী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৩৫

১৮ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পত্র পেয়েছি। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নামে অভিহিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে মানবসুলভ দুর্বলতা থাকবেই। বান্দার কাজ হলো বন্দেগী পূর্ণ করার যথা সম্ভব চেষ্টা করা তা সত্ত্বেও আমল বা বন্দেগীতে দোষ–ত্রুটি হয়ে গেলে তজ্জন্য

শরমিন্দা হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। যে কেউ নিজেকে মানদন্তরূপ পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে অপূর্ণ মানুষ।

প্রাপক-
মাহমুদ হাসান খান
নাযেমাবাদ, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র-৩৬

৫ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। স্বয়ং খৃষ্টানদের লিখিত তাওরাত ও ইনজিলের ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন যে, এ সব কিতাবের বিকৃতিকে তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছেন। আর কিছু নয় শুধু এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার "বাইবেলে' সম্পর্কীত প্রবন্ধটি পাঠ করে দেখুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের মধ্যে কি ভাবে অবশিষ্ট ছিল প্রশ্নের জবাব হলো-ঐ সব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেও বিকৃতি ঘটাবার জন্য তারা অবিরত চেষ্টা করতে থাকে। বাইবেলের উর্দু ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণগুলো যদি আপনি একত্রিত করেন তাহলে দিব্যি দেখতে পাবেন যে, তারা বিগত ষাট-সত্তর বছর সময়ে অনুবাদের মধ্যেও অনবরত পরিবর্তন করে আসছে।

প্রাপক-
ডঃ আব্বাস আলী শাহ নিযামী
মীরপুর খান।

খাকসার,
আবুল আলা

পত্র-৩৭

৯ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার প্রেরিত মধু পেয়েছি। আপনার এ লাগাতর দয়ার জন্যে বহুত শুকরিয়া যে, আপনার পক্ষ থেকে এ সুমধুর হাদিয়া সব সময় আসতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বেহেশতে মধুর প্রস্রবণে আপ্লুত করুন। আপনি যখনই তশরীফ আনবেন বিনা দ্বিধায় উপস্থিত করা হবে।

এখনো আপনার অস্থিরতার অবসান না হওয়ার কথা জেনে আফসোস হলো। কেবল আল্লার কাছেই বাসনা যে তিনি অবশেষে এ সব অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন। وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

আমার জানামতে পরকালীন চিন্তা সৃষ্টির একমাত্র পথ হলো সার্বক্ষণিক কুরআন তেলাওয়াতের বাধ্যবাধকতা। আখেরাতের স্মরণ করা এবং পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য দেয়ার গুরত্ব মন-মগজে উৎপাদন করার উপকরণ কুরআনের উপরে অন্য কিছুর স্থান নেই।

প্রাপক-
মুজাফফর খান সাহবে
মুজাফফরাবাদ, আযাদ কাশ্মীর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র —৩৮

১৪ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। সৃষ্টজগতের যদি স্রষ্টা থাকে তাহলে এ স্রষ্টা তো সৃষ্টজীব হবে এবং তার জন্যেও কোনো স্রষ্টা থাকলে তাকেও সৃষ্টজীব মানতে হবে। আপনার বন্ধুর যদি এ প্রশ্নটিকে অসীমের সীমানায় পৌঁছাতে চায় তাহলে জীবন ভর চালিয়ে যেতে দিন। অন্যথায় যেখানেই সে থমকিয়ে দাঁড়াবে সেখানেই তাকে সৃষ্টজগতের একজন মাত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব তাকে মানতে হবেই। রইলো এ কথা যে, স্রষ্টা ব্যতীত কোনো প্রকৃতি (Nature) এমনিতেই হয়ে গেলো আর এ প্রকৃতিই নিয়মিতভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ বিশাল সৃষ্ট জগতের রীতিনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি এমন অযৌক্তিক কথা মানতে পারে সে ব্যক্তির চিন্তায় এ বিশ্বজগতের একজন মহান স্রষ্টা নিয়ন্ত্রণকারী ও শিল্পীর অস্তিত্ব যখন অযৌক্তিক মনে হয় তখন বিশ্বাস হয় না যে, লোকটি সত্যিই সজ্ঞানে ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে এসব বলছে। আমরা মনে করি জ্ঞানের নামগন্ধও লোকটি পায়নি। আসলে লোকটির ইচ্ছা হলো আল্লাকে অস্বীকার করা যাতে করে সে জীব-জানোয়ারের মতো স্বেচ্ছাচার হয়ে চলতে পারে।

ইসলামের অনুসৃত রীতি-নীতিতে অনেক লোকের মোহমুক্তি ঘটলো শুধু এ খোঁড়া যুক্তির ভিত্তিতে যেসব অন্ধ মহোদয় নীতিগুলোকে ভুল ঘোষণা করতঃ এগুলোর বিরোধিতা করার দুঃসাহস করে তাদের কাছে জিজ্ঞেস – স্বাস্থ্য রক্ষার বিধানগুলো সঠিক কি বেঠিক? স্বাস্থ্য বিধান যদি সঠিক হয় তাহলে অধিকাংশ লোক এ বিধান লংঘন করে নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করার কারণ কি? বিধানগুলোর

মধ্যে এমন আকর্ষণ কেন নেই যাতে করে অধিকাংশ লোক সেগুলো পালন করে নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখবে এবং নগণ্যসংখ্যক লোক বিরোধিতা করে স্বাস্থ্য নষ্ট করবে? স্বাস্থ্য রক্ষার বিধানসমূহ সাধারণভাবে লোকেরা পালন না করা কি একথার প্রমাণ যে বিধানগুলো সঠিক নয়? মানুষ সব সময় অনিবার্যরূপে সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের গৃহীত কর্মপদ্ধতি হক ও বাতিলের মানদণ্ড এ কথা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবিকই স্বপ্রমাণিত কি?

প্রাপক- খাকসার,
আবদুল লতীফ শায়খ আবুল আ'লা
সিভিল লাইন, গুজরান ওয়ালা।

পত্র — ৩৯

১৯ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের আগে 'হযরত' শব্দটির ব্যবহার বর্জন করার আমার কারণ হলো শব্দটির ব্যবহার সব বুযর্গ লোকদের ক্ষেত্রে একেবারে সাধারণ হয়ে গেছে। এরূপ সাধারণ ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করে নবীকে সম্মান দেখানোর চেয়ে নবীর সান অনেক উর্ধ্বে। তবে 'আঁহযরত' শব্দের ব্যবহার আমার মতে সঠিক। কারণ নবীর স্মরণে এ শব্দটির ব্যবহার বহুল প্রচারিত।

প্রাপক- খাকসার,
মুহাম্মদ আকবর কুরাইশী আবুল আ'লা
লিয়াতকতাবাদ, জিলা- মিয়ানওয়ালী।

পত্র — ৪০

১৯ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। হযরত আলীর (রাঃ) কাদেসীয়া যুদ্ধে যোগদান না করার কারণ যখন তারা নিজেরা বলেনি এবং সমকালীন অন্য কোনো লোকও বলেনি তখন আমরা আজকে নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তার কারণ লিখতে যাবো কেন?

আমাদের এতোটুকুই বুঝা উচিত যে, এর যুক্তিসংগত কোনো কারণ থাকবে। কেননা হযরত আলী (রাঃ) জিহাদ থেকে হটে যাওয়ার ব্যক্তি নন এবং তিনি সমকালীন খলিফাদের অসহযোগিতার নীতি কখনো গ্রহণ করেনি।

খৃষ্টান রমনী খৃষ্টান থাকা অবস্থায় মুসলমানের সাথে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধা হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা দরকার তার পানাহারে হালাল হারামের তারতম্য থাকবে না এবং তার শিক্ষায় মুসলিম সন্তান মুসলমান থাকা কষ্টকর।

প্রাপক– খাকসার,
মাহমুদ মুলক আবুল আ'লা
হলি ফিল্ড ইয়র্ক, ইংল্যান্ড।

পত্র— ৪১

২৩ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। আপনার দৃষ্টি যদি বিগত ১২/১৩ শ' বছরের ফিকহী সাহিত্যের প্রতি পড়তো তাহলে আপনি দেখতেন যে, যারাই ফিকহী মাসআলা নিয়ে আলোকপাত করেছেন তারা সাধারণভাবে বিভিন্ন মতামত বর্ণনা করার পর একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং প্রাধান্য দেয়ার দলিলও বলে দিয়েছেন এটা এমন কোনো নূতন কাজ নয় যে আমিই এরূপ কাজের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা। এ কাজকে আপনি ভুল মনে করলে আপনার ধারণার ওপর আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকুন। এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে অথবা আপনার ও আমার সময়ের অপব্যয় করবেন না।

প্রাপক– খাকসার,
মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ আবুল আ'লা
রিনালী খোরদ, জিলা-মনটা গামরি।

পত্র— ৪২

১ মার্চ '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আফসোস! প্রতিটি বিষয়ই মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া

ফাসাদ করার অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ধীরস্থির মস্তিকে যদি বিষয়বস্তুর ওপর চিন্তা করা হতো তাহলে মত পার্থক্য এতোটা জঘন্য আকার ধারণ করতো না।

আমার মতে আসল বাক্য ছাড়া পবিত্র কুরআনের প্রকাশনা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কিন্তু যদি কেউ বিশেষ করে অমুসলমানদের জন্য কুরআনের অর্থ মূল ইবারত ছাড়া এ ধারণায় প্রকাশ করে যে, অমুসলমানদের হাতে পবিত্র কুরআন অপমানিত না হয়ে তারাও কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে তাহলে এটা ঠিক হবে। তবে শর্ত হলো পরিষ্কার ভাষায় লিখে দিতে হবে যে, এটা কেবলমাত্র অমুসলমানদের জন্য। এ কথাটাও সুস্পষ্ট থাকা উচিত যে, এটা মূল কুরআন নয়, অর্থ মাত্র। অধিকন্তু এটা যেন শুধু মাত্র অমুসলমানদের কাছে বিক্রি হয়, মুসলমানদের কাছে নয়—এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

প্রাপক—
মালীক রহমানিয়া স্টোরস,
বিগ্রোড়, মাদ্রাজ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৪৩

১৩ এপ্রিল '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি পাশ্চাত্য জীবন ও সমাজ সম্পর্কে চর্চা করার অপূর্ব সুযোগ পাচ্ছেন জেনে খুশী হলাম। আপনি সেসব ইংরেজদেরকেও খুব করে প্রত্যক্ষ করছেন যাদের একেকটি রূপ লাবণ্যের প্রতি আমাদের দেশীয় ফিরিংগী পূজারীরা প্রণয়াসক্ত ও মন্ত্রমুগ্ধ হতে চলছে। এখন আপনি দেখতে পেলেন যে, আমরা কথা–বার্তা, আচার–ব্যবহারে এবং ধ্যান–ধারণায় ইংরেজ হওয়ার কতইনা চেষ্টা করছি কিন্তু ইংরেজরা আমাদেরকে তাদের নিজেদের লোক মনে করতে তৈরী নয়। বরং উল্টো আমাদেরকে হীন মনে করে।

আমি কয়েকদিনের মধ্যেই হজ্জে যাচ্ছি। সম্ভবতঃ মে মাসের শেষ নাগাদ ফিরে আসতে পারবো। আশা করি জুনের মধ্যে আপনিও প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন।

প্রাপক –
এইচ, মুজাহিদ,
লন্ডন (ইংল্যান্ড)

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৪৪

২ এপ্রিল '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। 'কাহেন' ইহুদীদের একটি ধর্মীয় পরিভাষা, যার সমার্থক ইংরেজী শব্দ হলো (Priest আধুনিক আরবীতে ও 'কাহনাত' শব্দটি 'Priesthoo' (যাজকতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে হযরত ওযায়েরকে 'ওযরা কাহেন' বলা হয়েছে। ইহুদীদের সাহিত্যে তিনি এ নামেই পরিচিত।

প্রাপক–
হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব,
ফতেহগঞ্জ, কোবলপুর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৪৫

৭ জুন '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। এখন থেকে তেরশ বছরেরও বেশী আগে হযরত হোসাইন (রাঃ) ও ইয়াযিদের মধ্যে সংঘাত ঘটেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো এ সংঘাতের ওপর আলোচনা করা যায় বটে, কিন্তু এ নিয়ে মুসলমানদের তর্ক-বহস ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। যদি আজ প্রমাণিত হয় যে, ইয়াযিদ এরূপ ছিল, তবে কি আমরা তাকে বরখাস্ত করে তদস্থলে নতুন খলীফা নির্বাচন করতে পারবো? এ সব নিরর্থক এক বির্তক আর কতদিন চলতে থাকবে? যেসব সমস্যায় আমরা জর্জরিত সেদিকে মনোনিবেশ করা উচিত। শত শত বছর আগে অতিবাহিত ঝগড়া নিয়ে আমরা আর কতদিন পর্যন্ত ভুগতে থাকবো।

প্রাপক–
জনাব মুস্তাজির সাহেব,
কাচিখুরী, মুলতান।

খাকসার
আবুল আ'লা

পত্র— ৪৬

১০ জুন '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আরবী ভাষার সংক্ষিপ্ত তাফসীরগুলোর মধ্যে আমার মতে 'কাশশাফ'[১] সর্বোত্তম। যেসব স্থানে মুতাযিলা আকীদার ধারণা পরিলক্ষিত হয়ে সে কয়টি স্থান উপেক্ষা করলে কুরআন বুঝতে গ্রন্থখানি থেকে খুবই সাহায্য পাওয়া যায়। রাসূলের জীবন চরিত্রের উপর এর চেয়ে উত্তম কোনো গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আমার নযরে পড়েনি।

পারভেজ সাবের গোমরাহী সম্পর্কে আমি 'মানসারে রিসালত'[২] সংখ্যায় বিস্তারে আলোচনা করেছি। থাকলো কুফরী ফতওয়া দেয়ার প্রসংগ। আমার মতে জনসাধারণের জন্যে এ ফতওয়া উপকারী হলেও শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর এর খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত মহলই পারভেজ সাহেবের বিষবাষ্পে জর্জরিত হচ্ছে। এ কারণে আমার মতে কাফের ফতওয়া দেয়ার পরিবর্তে যুক্তি—প্রমাণের ভিত্তিতে তার মতামতের ভুলগুলো তুলে ধরাই উত্তম। কোনো কিছুর সমালোচনার জন্য চারটি শর্ত থাকে। প্রথমতঃ সমালোচক ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিভংগী খুব ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে পারছেন, যার বক্তব্যের তিনি সমালোচনা করবেন। এ জন্যে শুধুমাত্র ঐ কিতাব অথবা প্রবন্ধটিই তার সামনে থাকলে চলবে না, যেটির সমালোচনা তিনি করবেন তার সামগ্রিক বক্তব্য এবং দৃষ্টিভংগীও সামনে রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সমালোচনায় ব্যাক্তিগত শত্রুতা কিংবা মিত্রতার দখল থাকবে না। তৃতীয়তঃ সমালোচনা যুক্তি ও ভদ্রজনোচিত পদ্ধতিতে হওয়া চাই। চতুর্থতঃসমালোচনাকারী এবং তার পাঠক কোনো লোকের কোনো রায়ের ভুলকে ঐ লোকটির সব কিছুকেই ভুল বলে ধরে নেবেন না। অনেক বড় লোকেরও কোনো রায়ে ভুল হতে পারে কিন্তু তাতে তার মর্যাদা র তারতম্য ঘটেনা।

প্রাপক—
হাবীবুর রহমান খান
গুড়গাঁও, পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত।

খাকসার
আবুল আ'লা

---

১. এর পূর্ণনাম الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ইমাম যমখশরী (মৃত ৫২৮ হিঃ) কর্তৃক প্রণীত।

২. এ সংখ্যাটি سنت کی آئینی حیثیت নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

পত্র— ৪৭

১০ জুন '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। যতোটুকু আমি জানি প্রাচীন আর্মেনীয়, সিরীয় এবং হিব্রু ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের ভিত্তিতে আরবী ব্যাকরণের প্রাচীন লেখকগণ কিছু লিখেননি। অবশ্য পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়ে অনেক কিছুই লিখেছে। হিত্তি (Hittee) জাতির সাথে প্রাচীন আর্য জাতির কোনো সম্পর্ক ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এরা সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের একটি প্রাচীন বংশ। অবশ্য ফনিকী (Phoenician) জাতি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তারা আর্য জাতির বেঁচে যাওয়া লোকদের বংশোদ্ভূত।

আরবী ভাষা সম্পর্কে এখনো অনেক ভাষা ও তত্ত্ববিদদের ধারণা যে, এটাই প্রকৃত প্রাথমিক সেমিটিক ভাষার নিকটতম ভাষা।

প্রাপক–
সাইয়্যেদুল আবরার সাহেব,
ইন্ডিয়ানা ইউনিভারসিটি, ইন্ডিয়ানা.
ইউ, এস, এ,

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৪৮

১৫ জুন '৬৩

শ্রদ্ধেয়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

১২ জুন আপনার চিঠি হস্তগত হয়। আপনি প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে আমার জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা জোগাড় করতে স্টেট ব্যাংকে সুপারিশনামা পাঠিয়ে দিয়েছেন জেনে খুশী হলাম। [১] এ জন্যে আমি প্রেসিডেন্ট ও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এতে ইনশাআল্লাহ আমার কাজ অনেক সহজ হবে।

আপনি খৃষ্টান পাদ্রীর যে বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা যদি আমি পেয়ে যাই তবে তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। অতিরিক্ত যে উপকরণই আপনি যোগাড় করতে পারেন তা আমার কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন, যাতে আমার আসন্ন কাজগুলো অধিকতর উত্তম পন্থায় সম্পন্ন করতে পারি।

আফ্রিকায় বর্তমানে আমার সামনে যেসব কাজ তা সংক্ষেপে এই যে, কেনিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত এ মহাদেশের গোটা পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের

---

১. তখন আফ্রিকায় কাজ করার জন্যে এক হাজার পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করার মঞ্জুরি দেয়া হয়। (সংকলক)

অনেক মুসলমান বসবাস করে। তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীও আছে। এমনিভাবে সেখানে আরবেরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক আছে। আমার ইচ্ছা ওসব আরবী ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানদেরকে আফ্রিকার মুসলমানদের সাথে একত্রিত করে ইসলামের প্রচার ও প্রশিক্ষণের এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব যাতে সেখানকার লোকেরা নিজেদের সাথে নিজেদের অর্থে নিজেদের অর্থে নিজেদেরে মানুষ দিয়ে তা পরিচালনা করতে পারে। আমরা পাকিস্তান থেকে এমন কতিপয় যোগ্য লোক পাঠাবো যারা প্রচার ও শিক্ষা কার্যক্রমে তাদেরকে পথ প্রদর্শন ও ট্রেনিং দিয়ে ঐ পদ্ধতি পরিচালনার জন্যে সুচারুরূপে গঠন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমি আগামী অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাসে মাম্বাসা অথবা দারুস সালামে একটি সম্মেলন করতে চাই। সম্মেলনের স্থান ও তারিখ নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবকে বাইরে পাঠিয়েছি। তিনি ফিরে আসলেই সঠিকভাবে জানা যাবে যে, সম্মেলন কোথায় এবং কখন হবে। যারা প্রথম থেকেই আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রচার ও প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের সকলকেই এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আরব দেশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোকদেরকেও আমন্ত্রিত করা হবে, যাতে মূল আফ্রিকী ও পাকিস্তানী এবং হিন্দুস্থানী মুসলমানদের সাথে আরবীর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় আমাদের সাহায্য করতে পারে। তাদের সকলের পরামর্শক্রমে ইনশাআল্লাহ আমরা এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবো, যা একদিকে আফ্রিকার মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে অন্য দিকে অমুসলমান আফ্রিকানদের কাছে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌছাবে।[১] মক্কাভিত্তিক রাবেতায়ে আলমে ইসলামীও ওয়াদা করেছে যে, এ ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালনায় সে আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

যেসব আফ্রিকী ভাষায় এখনো কুরআনের তর্জমা হয়নি সে সব ভাষায় কুরআন তর্জমা করানোর ব্যবস্থা আমাদের পরিকল্পনায় আছে। বরং উগান্ডীয় ভাষায় একটি তর্জমা আমরা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। বর্তমানে একজনকে এর ছাপা ও প্রকাশনার জন্যে উগান্ডায় পাঠনো হচ্ছে।[২]

---

১. পরিতাপের বিষয় যে, বিভিন্ন কারণে মাওলানা এ সফরে যেতে পারেননি, ফলে সম্মেলনও হয়নি। তবে আল্লার ইচ্ছায় নাইরোবীতে দাওয়াত ও শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

২. সম্প্রতি উপকূলীয় ভাষায়ও কুরআনের তর্জমা হয়ে গেছে।

এ সম্পর্কে ও পরিকল্পনা নিয়ে আমি আফ্রিকা সফরে যাচ্ছি। আশা করি এ কাজের পরিপূর্ণতায় আপনার সাহায্য ও সহানুভূতি খুবই উপকারী হবে।

প্রাপক –
কুদরতুল্লাহ শাহাব সাহেব,
সেক্রেটারী, মিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশান এন্ড ব্রডকাষ্টিং,
রাওয়ালপিন্ডি

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র– ৪৯

২৭ জুন '৬৩

শ্রদ্ধেয়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমি এ কথা বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম যে, কারো সম্পর্কে নিজে মিথ্যা দোষারোপ করা অথবা অন্যের কাছে মিথ্যা কথা শুনে বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করা এবং প্রচার করা তাসাউফের কোন স্তর! তাসাউফ দ্বারা যদি ইসলামী তাসাউফ উদ্দেশ্য হয় তবে তার সাথে এ নোংরা চরিত্র কোনোক্রমেই খাপ খেতে পরেনা। প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরুদ্ধে কোনো ফতওয়ায় দস্তখত করা তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত তাকে কাফের ফতওয়া দেয়া হয়েছে এমন কোনো ফতওয়া আদৌ আমার নজরে পড়েনি। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তারা কোথায় এ ফতওয়া দেখেছে। যদি তারা নিজেরা না দেখে থাকে তবে কিসের মাধ্যমে জানতে পেলো যে, এরূপ ফতওয়া দেয়া হয়েছে এবং তাতে আমার দস্তখত রয়েছে? এ মিথ্যার ওপর আরো জঘন্য মিথ্যা রটনা করা হয়েছে যে, এ দস্তখতের বিনিময়ে আমি পেয়েছি অঢেল অর্থ। মনে হয় তাদের অন্তরে আল্লাভীতি ও পরিণামের চিন্তা একেবারেই নেই। তারা মিথ্যা দোষারোপ ও অপবাদ দেয়াকে নিজেদের জন্যে একান্ত হালাল করে নিয়েছে।

প্রাপক–
পীর বাবা ওমর
বোম্বাই বাজার, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৫০

১ জুলাই '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর নিম্নে দেয়া গেলঃ

একঃ আল্লাহ'র কালামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি কোনো কথা উত্তম পুরুষ হিসেবে বলা হয় তবে এর অর্থ এই নয় যে, এটা স্বয়ং আল্লাহ বলছেন। বরং আরবী ভাষায় অন্যের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাকে বর্ণনা করার এ পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত। বিশেষতঃ কুরআনের আরবী তাফসীরে এ রীতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দুইঃ তেলাওয়াতের আভিধানিক অর্থ তো পড়ে শুনানো। কিন্তু ফেরেশতাদের মাধ্যমে উপদেশ নসীহত অনেক সময় সরাসরি হয় আবার অনেক সময় অন্য মানুষের সাহায্যে হয়ে থাকে। সরাসরি উপদেশ- নসীহত তারা ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে করে থাকে। মানুষের মাধ্যমে উপদেশের পদ্ধতিটা এরূপ হয়ে থাকে যে, কোনো দুর্ঘটনা দ্বারা আল্লার বান্দারা উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। তারপর অর্জিত শিক্ষা অন্য লোকের সামনে পেশ করবে। এ দ্বিতীয় জিনিসটি যেহেতু ফেরেশতাদের কর্মতৎপরতারই ফলশ্রুতিঃ এ কারণে কাজটিকে তাঁদের প্রতি সম্বোধন করা যায়।

তিনঃ নবুয়াতের ওহী তো বিশেষভাবে শুধু নবীদের জন্যই প্রযোজ্য। তবে ইলকা ও ইলহাম গাইরে নবীদের জন্যেও হতে পারে। ইলকা ও ইলহাম সম্পর্কে আমি কখনো বলিনি যে, এগুলোও নবীদের জন্যে নির্দিষ্ট। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলেছি যে, গাইরে আম্বিয়ার ইলকা ও ইলহাম জ্ঞান লাভের কোনো নির্ভুল মাধ্যম নয়। কোনো ইলহাম তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন তা নবীর ইলমের অনুগামীহবে।

চারঃ إِلَّا بِسُلْطَانٍ বাক্যাংশটুকু أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ থেকে বের হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে নয়। أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ দ্বারা তো সমগ্র জগত বুঝায়। এ কারণে سلطان দ্বারা অনিবার্যভাবে এমন শক্তি উদ্দেশ্য যা খোদার খোদায়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত মানুষ তৈরী করতে পারে। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, এমন শক্তি মানুষের হতে পারে না। এ কারণে আমার ধারণা এই যে, إِلَّا بِسُلْطَانٍ শব্দ বের হওয়ার সম্ভাবনার ওপর নয় এবং বের হওয়া অসম্ভব একথা বুঝায়।

প্রাপক -
এরশাদ আমীন,
জাম পুরন, হায়দারাবাদ

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৫১

৫ জুলাই '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। যে পাঁচ প্রকার বিদয়াত ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী ফতহুল বারীতে অনুমোদন করেছেন। হাদীসের ওপর চিন্তা- ভাবনা করলে প্রত্যেক লোকই সেগুলো বুঝতে পারবে। বিদয়াত দ্বারা যদি এমন সব নতুন কর্মকান্ড বুঝানো হয় যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছিল না, তবে এরূপ প্রত্যেক নতুন কাজই গোমরাহী নয়। বরং এগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্য করুনঃ-

একঃ নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ যামানায় কুরআন শরীফকে একটি গ্রন্থাকারে সংকলিত করেননি পরে সাহাবাগণ গ্রন্থাকারে সংকলন করে লিপিবদ্ধ করে যান। অতঃপর সে নির্ভরযোগ্য সংস্করণের অনুলিপি প্রচার তারা করেন। এটা অবশ্যই নতুন কাজ ছিল। কিন্তু দ্বীনের হেফাজতের জন্যে এর প্রয়োজন ছিল সমধিক। এ কারণে এটা ছিল ওয়াজিব বিদয়াত।

দুইঃ রাসূলের যুগে জুময়ার জন্যে একটি মাত্র আযান ছিল। হযরত উসমান (রাঃ) আরো একটি আযানের প্রচলন করেন। এটাও ছিল একটি নতুন কাজ। কিন্তু মদীনাবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর জুমায়ার জন্যে লোকদেরকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে সাহাবাগণ এটা কবুল করেন। এ বিদয়াত ছিল মুস্তাহাব।

তিনঃ রাসূলের যুগে লোকেরা উটে চড়ে কিংবা পদব্রজে হজ্জে আসতেন। আজকাল মটর, বিমান এবং স্টীমারে হাজীগণ যাতায়াত করেন এটাও নতুন কাজ। কিন্তু একটি ইবাদত আদায় করার জন্যে এমন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছিল, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং অন্য কোনো শরয়ী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ কারণে এ বিদয়াত মুবাহ।

চারঃ নবী ও খেলাফতে রাশেদার শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সেনাবাহিনীর পরিচয়সূচক পতাকা তো অবশ্যই ব্যবহৃত হতো কিন্তু পতাকাকে

অভিবাদন দেয়া হতো না। পতাকার অভিবাদন হারাম হওয়ার কোনো দলীল নেই। কিন্তু এ কাজ ইসলামের সার্বিক দিক থেকে যথাযথ নয়। এ জন্যে এটা মকরূহ বিদয়াত।

পাঁচঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মেয়েরা সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং ঋতুবতী মেয়েরা অলংকার পরিধান করে মসজিদে আসতো না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এরূপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এখন যদি মেয়েরা এমন অবস্থায় মসজিদে যাতায়াত করে তবে এটা হবে হারাম বিদয়াত।

বিদয়াতের এ পাঁচ প্রকার স্বয়ং হাদীসের ওপর গবেষণা করলে জানা যায়।

প্রাপক-
মুহাম্মদ আশরাফ আফরোদী
ইয়াসিনাবাদ, পেশাওয়ার।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৫২

১৮ জুলাই '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি শূরার অধিবেশন চলা কালে পৌছে। অত্যন্ত ব্যস্ততার দরুন সে সময় ডাকবাক্স খোলার অবকাশ পর্যন্ত মিলেনি। অনেক দিনের জমাকৃত চিঠির মধ্যে আপনার চিঠিও পেলাম। জবাবদানে এতোটা গৌণ হওয়াতে ওযরখাহী করছি।

'আমি নিজেকে দৈনন্দিন রাজনীতির মধ্যে বিলীন করে দেই।' আমার কাজ সম্পর্কে আপনার এ অনুমান প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো মৌলিক সংস্কারমূলক কাজের প্রতি আন্তরিকতা রাখে না এবং সে সব কাজেরই ফলাও করে প্রচার করে যা দৈনন্দিন রাজনীতির সাথে সম্পর্কীত। এ কারণে আমার এবং জামায়াতে ইসলামীর কাজের সামান্যতম অংশ সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত হন। আর পাঠকবর্গ মনে করেন আমরা শুধু এ কাজই করে থাকি। অথচ আমরা নীরবে শহর ও গ্রামে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিরাম সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের শক্তি ও সময়ের খুব কম অংশ ঐ রাজনৈতিক কাজে ব্যয় করি যার

আসল উদ্দেশ্য হলো দেশীয় রাজনীতিতে ধ্বংসাত্মক কাজে যতটুকু সম্ভব বাধা দেয়া।

পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশের অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করার পর যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি তা আমি আমার একটি বিবৃতিতে বর্ণনা করেছি। বিবৃতিটি সে বছরই হজ্বের সময় মক্কা শরীফে প্রদান করি। এ বক্তৃতাটি ১৯৬৩ সনের জুন সংখ্যায় তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়। আপনি সেটা দেখে নিবেন। 'রহমাতুল্লিল আলামীন' সংখ্যার জন্যে আপনার ফরমায়েশ শুধু সহানুভূতির যোগ্যই নয় বরং সম্মানযোগ্য। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যস্ততা এবং শক্তি সামর্থের সীমাবদ্ধতা এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বন্ধু–বান্ধবদের সম্মানযোগ্য ফরমায়েশগুলোও পূরণ করতে আমাকে অক্ষম করে ছেড়েছে।

আপনার কোনো খেদমত গ্রহণ করা যদি আমার জন্যে কিছুটা সম্ভব হতো তবে ওযর করতাম না।

প্রাপক–
সুরেশ কাশমেরী সাহেব,
সম্পাদক 'চাট্টান' লাহোর।

খাকসার ,
আবুল আ'লা

পত্র —৫৩

৫ আগষ্ট '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি যেসব জটিলতার উল্লেখ করেছেন সেগুলো এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, একটি মুসলিম জাতি ইসলামের ওপর বিশ্বাসও রাখে এবং রাষ্ট্রও মুসলমানের হাতে। কিন্তু ইবাদাত ব্যতীত অবশিষ্ট গোটা জীবন পদ্ধতি ইসলামের খেলাফ চলছে। এমতাবস্থায় আপনার উল্লেখিত সমস্ত জটিলতার উদ্রেক হওয়া অতি স্বাভাবিক। তার সমাধান এটা নয় যে, আমরা আমাদের রশি ঢিলা করে দেবো এবং যেদিকেই এ পদ্ধতির স্রোতধারা প্রবাহিত হবে সেদিকেই আমরাও ভেসে যাবো। বরং এর সমাধান এই যে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যতটুকু সম্ভব কষ্ট স্বীকার করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ইসলামী হুকুম–আহকাম পালন করে যাবো। আর যেখানে নিরুপায় সম্পূর্ণ অপারগ সেখানে অনৈসলামী পদ্ধতি অত্যন্ত ঘৃণা ও অনিচ্ছার সাথে গ্রহণ করতে হবে। সেগুলোকে বৈধ করার এবং নিজের মন থেকে সেগুলোর অবৈধতার বোঝা ফেলে দেয়ার চিন্তা করা যাবে না।

এর সাথে এটাও দরকার যে, আমাদের প্রত্যেকেরই ঐ প্রচেষ্টায় শরীক হওয়া উচিত যা এ অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত।

প্রাপক–
মুঃ আকরাম সাহেব,
লায়ালপুর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৫৪

১৫ আগষ্ট '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমি মরহুম মাওলানা আযাদ, মরহুম মাওলানা মাদানী এবং তাদের সমপর্যায়ের লোকদের কোনো কোনো দৃষ্টিভংগীর সাথে তাদের জীবদ্দশায় অবশ্যই মতপার্থক্য করেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে না তাদের জীবদ্দশায় আমি তাদের বিরোধিতা করেছি আর না তাদের ওফাতের পর আমি এটা সঠিক মনে করি যে, কেউ তাদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করুক। তাদের জীবদ্দশায়ও যে এক আধবার মতবিরোধ করেছি, তা ছিলো প্রয়োজন অনুযায়ী এক আধটু। তাদের বিরোধিতা করা জীবনের লক্ষ্য বানাইনি।

প্রাপক–
মুহাম্মদ আরেফ সাহেব
সরগোধা।

বিনীত,
আবুল আ'লা

পত্র — ৫৫

২০ আগষ্ট, ৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগি জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কীত সংখ্যায় কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেগুলো আপনার নজরে পড়েনি। আমার মতে যে সাহিত্য কল্যাণের আহবান এবং সংশোধনের জন্য উৎসাহিত করে তা বিশুদ্ধ সাহিত্য। আর যে সাহিত্য শুধুমাত্র বিনোদনমূলক হয় কিন্তু অন্যায়ের দিকে উৎসাহিত করে না তা মুবাহ। আর যে সাহিত্য অন্যায়ের দিকে উৎসাহিত করে তা নাপাক।

তাবলিগী জামায়াত ও জমীয়তে ওলামা কল্যাণমুখী খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছে। সেগুলোকে আমি মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অপরিপক্কতাও আছে যার সংশোধনের জন্য আমি সময় সময় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি।

জামায়াতে ইসলামীর কাজ দূর থেকে অবলোকন করে ভর্ৎসনা করতে অভ্যস্থ লোকদের আপত্তির জবাব দেয়া নিরর্থক। এর জবাবে কালক্ষেপন না করে অন্য কোনো কল্যাণমুখী কাজে সে সময়টুকু ব্যয় করাই উত্তম। যারা জামায়াতের কাজ সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হতে চেষ্টা করে তারা তো এটা বলতে পারবে যে, যতোটা কাজ এ জামায়াতের করা উচিত ততোটা সে করছে না। কিন্তু এ কথা বলতে পারবে না যে, তারা আদৌ কিছু করছেনা।

প্রাপক –
শামস তিবরিজ খান,
দারুল উলুম, দেওবন্দ।

ইতি
আবুল আ'লা

পত্র — ৫৬

২৮ আগষ্ট '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। যারা আপনার কাছে বলে, আমি রমযান মাসে রোযা রাখি না তারা মিথ্যাচারে লিপ্ত। কখনো রোগের দরুন কাযা হয়ে থাকবে যা প্রত্যেক রোগীর বেলায় হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রোযা না রাখার কথা সর্বৈব মিথ্যা।

আমি মুহাদ্দিসগণের নিয়ম মোতাবিক তিরমিযী ও মুআত্তা পাঠ গ্রহণ করে করে অধ্যয়ন করেছি। বাদ বাকী কিতাব নিজে অধ্যয়ন করেছি।

প্রাপক–
গোলাম রাসুল সাহেব,
মীরেশাহ, (ছাদেকাবাদ)।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৫৭

৩১ আগষ্ট '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। বর্তমান যামানার মনোবিজ্ঞানীরা দু'টি রোগে আক্রান্ত। একটি এই যে, তারা উর্ধ জগতে বিশ্বাসী নয়, যা মানুষ ও তার চতুস্পার্শ্বস্থ সৃষ্ট জীবের ওপর ক্রিয়াশীল। দ্বিতীয় এই যে, মৌলিকভাবে তারা মানুষকে নিছক একটি অনুভূতিমূলক জীব মনে করে এবং মানুষের মধ্যে জৈবিক সত্তা থেকে উর্ধতর কোনো রূহ বা রূহানীয়তের অস্তিত্ব স্বীকার করে-না। এ কারণেই তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা ওরূপ করেছে যা ফ্রয়েড প্রমুখদের নিকট আপনি দেখেছেন।

ইসলাম যেহেতু উর্ধজগতে বিশ্বাসী এবং মানুষের মধ্যে রূহেরও অস্তিত্ব স্বীকার করে , এ কারণে সে স্বপ্নের এহেন ব্যাখ্যার ঘোর বিরোধী। ইসলাম স্বপ্নকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে। একটি সত্য স্বপ্ন, অপরটি অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন।

সত্য স্বপ্ন যে স্বপ্ন (রুইয়ায়ে সাদিকাহ) তা তার নামেই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এমন স্বপ্ন যা অনুভূতির অধিকার মুক্ত হয়ে উর্ধ জগতের মানবাত্মার সম্পদ প্রতিষ্ঠার পরিণতিতে পরিদৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় অনেক সময় মানুষ কোনো তথ্য বা আসন্ন ঘটনার প্রকৃত চিত্র দেখতে পায়। আবার কখনো মানুষকে কোনো ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরামর্শ দেয়া হয়। তখন সে অনুভব করে, সে যেন সূর্যালোকে জাগ্রত অবস্থায় কোনো কথা শুনছে অথবা কিছু প্রত্যক্ষ করছে। আবার কখনো এগুলো তার সামনে প্রতীকী চিত্রে ভেসে উঠে। যার তথ্য নির্ধারণ করা খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানে পারদর্শীগণ ওসব প্রতীকের সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য অনেক সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। যদি এমনিভাবে তথ্য নির্ধারিত না হয় তবে পরে কোনো সময় যখন তার সামনে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবে উপস্থিত হয় তখন এটা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এ হচ্ছে আমার দেখা অমুক স্বপ্ন যার সঠিক তাৎপর্য আমি বুঝতে পারিনি। এর সঠিক তাৎপর্য এটাই ছিল। হযরত ইউসুফের (আঃ) দেখা দু'টি স্বপ্ন এরূপ প্রতীকী ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যার সঠিক উপায়ের প্রতি আমাদেরকে পথ নির্দেশনা দান করতে পারে। তার ব্যাখ্যা স্বয়ং কুরআনেই বলা হয়েছে। নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কিরাম কিংবা তাবেয়ীগণ কোনো কোনো স্বপ্নের ব্যাখ্যার যে বিবরণ দিয়েছেন তদ্বারাও এর কোনো কোনো পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান আল্লাহ প্রদত্ত দূরদর্শীতার ওপর খুবই নির্ভরশীল। এর কোনো ছকবাধা নিয়ম নেই যে, তাবীরকে বিজ্ঞানের মত একটি শাস্ত্র হিসেবে আয়ত্ত্ব করে নেবে এবং প্রত্যেক রূপক চিত্র কিংবা শব্দের জন্যে একটি বিশেষ অর্থ নির্দিষ্ট করে নেবে।

থাকলো, অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্নের কথা। এটা বিভিন্ন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এক ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে ওসব স্বপ্ন যে স্বপ্নে একজন পথভ্রষ্ট কিংবা দুর্বল আকীদা সম্পন্ন লোকের মধ্যে শয়তান কোনো বাতিলকে হক কিংবা কোনো হককে বাতিল হওয়ার প্রত্যয় সৃষ্টি করে দেয়, তাকে এমন কিছু চিত্র দেখায় এবং এমন কিছু কথা শুনায় যা তাকে অপরিহার্যভাবে গোমরাহ করে দেয়। এ সব স্বপ্ন অন্য আরেক প্রকার আছে যা কোনো ব্যাধির কারণে মানুষ দেখে থাকে। এ সব বিভিন্ন প্রকারের স্বপ্ন যদি একত্রিত করা হয় তবে ফ্রয়েডের দর্শনের আওতাধীনে এগুলোর কারণ বর্ণনা করা যায় না। না বর্তমান মনোবিজ্ঞানের কলা–কৌশল এগুলো থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কিংবা এগুলোর অর্থ নির্ধারণ করতে যথেষ্ট। এ লোকদের ত্রুটি এই যে, প্রথমতঃ তারা একটি দর্শন দাঁড় করায়। তারপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত দর্শনের আওতায় সমস্ত স্বপ্নের একটি ছকবাধা ব্যাখ্যা দিতে থাকে। অথচ সঠিক পন্থা এই যে, অধিকাংশ স্বপ্ন একত্রিত করে স্বাপ্নিকের জীবন চরিত ভালো করে নিরীক্ষা করার পর এ মতামত দেয়া যে, অস্বস্তিকর স্বপ্ন কোন কোন ধরনের হতে পারে এবং বিভিন্ন সময়ে সেগুলো কোন কোন কারণে বিভিন্ন লোকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আপনার অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর ওপরে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট প্রশ্নের জবাব এই যে, স্বপ্নের ইসলামী দৃষ্টিভংগি শুধুমাত্র কুরআন ও সঠিক হাদীসের মাধ্যমেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পরে মুসলমান চিন্তাবিদগণ যে দৃষ্টিভংগির বিবরণ দিয়েছেন সেগুলো আপনি সেসব চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভংগি হিসেবেই বর্ণনা করতে পারেন।

সত্য স্বপ্নকে নবুয়্যাতের একটি অংশ সাব্যস্থ করার দু'টো তাৎপর্য। একটি এই যে, নবীদের স্বপ্ন ওহীর প্রকার হয়ে থাকে, অস্বস্তিকর স্বপ্নের প্রকার নয়। দ্বিতীয় এই যে, সত্য স্বপ্ন যেহেতু মানবাত্মা ও উর্ধজগতের মধ্যকার এমন একটি সম্পর্কের পরিণতিতে হয়ে থাকে যাতে মানবীয় ইচ্ছাশক্তি লাভ অথবা অনুভূতি প্রতিবন্ধক হয় না। এ কারণে সে অতি সূক্ষ্ম সাদৃশ্যতা ঐ সম্পর্কের সাথে বজায় রাখে যা অতি উচ্চ ও পরিপূর্ণ অবস্থায় নবীদের কালব ও উর্ধজগতের মাঝখানে ওহী এবং ইলহামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাপক–
আফতাব আহমদ
গোমটী বাজার, লাহোর ।

বিণীত,
আবুল আ'লা

পত্র — ৫৮

২ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পত্র পেয়েছি। নারী জাতির জন্যে মেয়ে কিংবা নারী শব্দের ব্যবহার প্রচলিত নিয়ম। এটা কোনো শরয়ী কিংবা বিধিবদ্ধ কথা নয়। বড়জোর ২০/২২ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ে শব্দের ব্যবহার হয়। এরপর থেকে নারী বলা হয়। এমনিভাবে ঐ বয়স পর্যন্ত ছেলে। তারপর থেকে পুরুষ কিংবা লোক বলা হয়। আপনি ২৫/৩০ বৎসর বয়স্ক কাউকে ছেলে বললে সে নিজেই তা খারাপ মনে করবে এবং লোকেরাও আপনাকে নিয়েহাসবে।

প্রাপক–
মুহাম্মদ ইসহাক ছাহেব,
করাচী সদর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৫৯

৫ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

চিঠি পেয়েছি। সূরায়ে হুজুরাতের قالت الاعراب امنا আয়াতকে সূরায়ে তাওবার ৯০ থেকে ১০১ আয়তের আলোকে পাঠ করলে বক্তব্য ভালভাবে বুঝে আসবে। মদীনার বাইরে শহরের আশে-পাশে যেসব বেদুইন বসবাস করতো তাদেরকে "আবা" বলা হতো। তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত কেবল এ কারণে হয়েছে যে, আনুগত্য ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু না তারা জিহাদে গিয়ে লড়াই করেছে, না নিজেদের ঘাড়ে বিপদ চাপানোর জন্যে তৈরী ছিল, আর না সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত দিতে রাজী ছিল। তদুপরি তাদের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন মুসলমানদের বিজয়ে অংশ গ্রহণের প্রসংগ আসতো তখন তারা তুলনামূলক মজবুত ঈমানের দাবী করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঐ সব লোক নিজেদের দাবী এমনভাবে পেশ করতো যেন তারা ইসলামের গন্ডীতে প্রবেশ করে নবীর ওপর কোনো অনুগ্রহ করেছে। তাদের এ সব তৎপরতা সম্পর্কেই সূরায়ে হুজুরাতে বলা হয়েছে যে, এ সব লোক ঈমানের দাবী করে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল মাত্র বাহ্যিক আনুগত্যই কবুল করেছে। অন্তরে ঈমান থাকলে তারা না জিহাদ করতে অনীহা প্রকাশ করতো আর না নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করাকে নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে ধৃষ্টতা দেখাতো।

এখানে 'ইসলাম' শব্দটি 'ঈমান' ব্যতীত শুধুমাত্র আনুগত্যের অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, কুরআনে ইসলাম ও ঈমান দু'টি আলাদা পরিভাষা এবং মুসলিম ও মু'মিনের দুটি স্বতন্ত্র অর্থ। যদি কেউ এ দাবী করে তবে তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, - إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ অর্থ কি এবং হযরত ইবরাহীমের (আঃ) এ দোয়ার তাৎপর্য কি رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

প্রাপক–
সাহেব খান,
সুবেদার মেজর, ভেলাছগংগ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৬০

১১ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার দীর্ঘ বিবরণ সম্বলিত চিঠি ২ সেপ্টেম্বর আমার হস্তগত হয়। দুঃখের বিষয় যে, আপনি এমন সময় আমার সাথে পত্র বিনিময় করছেন, যে সময় আমার ব্যস্ততা অনেক বেশী ছিল। এমন বিষয় উত্থাপন করেছেন যা নিয়ে বিশদ আলোচনার সময় বের করা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। এ কারণে সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছি।

আপনার বিগত চিঠি–পত্র দ্বারা আমার এ ধারণা জন্মেছিল যে, ইসলামের সাথে আপনার কিছুটা সম্পর্ক এখনো অবশিষ্ট আছে। এ কারণে আমি আপনাকে লিখেছি যে, এখন আপনি ইসলামী পরিমন্ডল থেকে বাইরে নন। কিন্তু আপনার এ চিঠি এবং বক্তৃতা যার অনুলিপি আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন তা দেখার পর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আপনি এখন আর মুসলমান নন। এ কারণে বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এখন আপনি আপনাকে মুসলামান হিসেবে লোকের সামনে পেশ করাটা সততা বিরোধী। আপনাকে পরিষ্কার বলতে হবে যে, আপনি মুসলমান নন। আপনার নামও পরিবর্তন করা উচিত। যাতে নাম দেখে কেউ ধোঁকায় না পড়ে। এখন আপনার নাম কি রাখবেন এ পরামর্শ দেয়া আমার কাজ নয়। থাকলো, সেসব বিষয় যেগুলো সম্পর্কে আপনি কথা–বার্তা বলছেন। আপনার বক্তব্য পাঠ করার পর সেগুলো সম্পর্কে আমি এ অনুভব করছি যে, আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামান্য জ্ঞান নিয়ে অপর্যাপ্ত চিন্তা–ভাবনার ভিত্তিতে কিছুটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আপনার আলোচনায় আমি এটাও অনুভব করতে পেরেছি যে,

আপনি আপনার গৃহীত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় আমি বুঝতে পারছি না যে, আপনাকে বুঝানোর জন্যে আমি কি করতে পারি। এ কথা আপনার নিজেরই ফয়সালা করা দরকার যে, আপনি কি এ সব ধারণার ওপর সন্তুষ্ট আছেন এবং সন্তুষ্ট থাকতে চান নাকি উদার উন্মুক্ত মনে কিছুটা অতিরিক্ত গবেষণার অবকাশ আপনার আছে? যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ হাফেজ। আর যদি আরো কিছুটা গবেষণার অবকাশ থাকে তবে আপনি আমার বই-পত্রগুলো আবার প্রথম থেকে মনোযোগ দিয়ে ধীর স্থীর ও ধৈর্য সহকারে পড়তে থাকুন। সবগুলো বই না পড়েই আমার কাছে পত্র দেয়া শুরু করবেন না বরং সব কিছু পড়ার পর পরিশেষে ধীর স্থীর চিত্তে আপনি নিজেই এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করুন যে, এ অধ্যয়ন আপনার জন্যে নিজের ধারণাসমূহের ওপর দ্বিতীয়বার চিন্তার কোনো বুনিয়াদ যোগাড় করেছে কি না?

প্রাপক-
ইয়াকজান সাব সমীপেষু
কানাডা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৬১

১৬ সেপ্টেম্বর '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। বণি ইসরাঈল ও নাসারাদের কিতাব সম্পর্কে এ কথা জানার কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই যে, তাদের নবীদের প্রকৃত বাণীসমূহ কি ছিল এবং তাদের নিকট সেগুলো কতটা সুরক্ষিত আছে। আর কোন কোন স্থানে সেগুলো বিকৃত হয়েছে? এ কারণে বাইবেলের বাণীসমূহের বিশ্লেষণ করা আমাদের জন্য দুরূহ।

আমি যে উদ্দেশ্যে হযরত ইলিয়াসের সম্পর্কে তাদের বর্ণনার উধৃতি দিয়েছি তাতে শুধুমাত্র এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, বণি ইসরাঈলদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী এ হবে যে, বণি ইসরাঈলে পুনরায় এরূপ এক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটবে। আর বণি ইসরাঈল এতে মনে করে থাকবে যে, স্বয়ং ইলিয়াস পুনর্বার আগমন করবেন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লার পক্ষ থেকে এসেছে। জিবরাইল এগুলোর বাহক মাত্র। এ কারণে তাকে রুহুল আমীন বলা হয়। যে পয়গাম যে শব্দ সম্ভারে পাঠানো হয়েছে তা হুবহু আল্লার নবীর কাছে তিনি পৌছে দেন।

প্রাপক-
মুহাম্মদ হানীফ,
নারায়ণপুর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৬২

১৬ সেপ্টেম্বর '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। মাওলানা মরহুম আহমদ আলী সাহেব আমার বিরুদ্ধে কয়েক বছর যাবত অবিরত প্রোপাগান্ডা করতে থাকেন। কিন্তু আমি তাঁর জীবদ্দশায়ও কখনো তার বিরুদ্ধে কিছু লিখিনি এবং বলিনি। যদি আপনার বন্ধু মহলের কিছু শান্তিকামী লোক অবশিষ্ট থাকে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যার বিরুদ্ধে এতো সব প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে, মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের বিরুদ্ধে তার কোনো লেখা কিংবা বিবৃতি তারা দেখেছে বা শুনেছে কিনা, যার উল্লেখ তারা করতে পারে। যদি কেউ এমন কোনো জিনিস পেশ করেন তবে সে সম্পর্কেও অবহিত করবেন। আর যদি পেশ করতে সক্ষম না হন তবে তিনি নিজেই বলুন, এর পরও কি আদের দৃষ্টিতে আমিই আভিসাপের উপযুক্ত? আমার নিজের ধারণা, যার মধ্যে কিছুটা ভদ্রতার অনুভূতি আছে এ ব্যাপারে তার দৃষ্টিভংগী এরূপ হবে না যেমনটি আপনার বন্ধু ব্যক্তিটি গ্রহণ করেছেন।

প্রাপক—
মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
লাহোর

খাকসার,
আবুলআ'লা

পত্র—৬৩

১৬ সেপ্টেম্বর ৬৩

মুহতারামা বোন,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, আপনি এমন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েও ইসলামের সঠিক ধারণা ও উৎসাহ রাখেন। আপনাকে এ পরামর্শ দেয়া তো আমার জন্যে মুশকিল যে, আপনি উচ্চতর শিক্ষার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে দিন। তবে এ পরামর্শ অবশ্য দেব যে, আপনি সাথে সাথে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের অভ্যাস রাখবেন। নিজের মধ্যে এতোটুকু ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করবেন যে, যে জিনিসকে আপনি নিজে ঈমানদারীর সাথে সত্য বলে মনে করবেন সে মোতাবেক যেন আপনি বাস্তব জীবন অতিবাহিত করেন।

ছেলে-মেয়ে উভয়ের সুশিক্ষার জন্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আমরা নিজেরাই তীব্রভাবে অনুভব করি। কিন্তু এ পথে মস্ত বড় বাস্তব অসুবিধাসমূহ

প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপায় ও উপাদান যে মহলের হাতে তারা এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। আর যে মহল এর প্রয়োজনীয়তা তিলে তিলে অনুভব করছে তাদের উপায় উপাদান খুবই কম।

প্রাপিকা-
রাশেদা মমতাজ,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৬৪

১৭ সেপ্টেম্বর ৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠি পেয়েছি। অভিযোগ করার রোগ যাদেরকে পেয়ে বসেছে তাদের সব সময়ই অভিযোগ করার জন্যে কোনো না কোনো কথা প্রয়োজন হয়ই।

বাদশাহ ফয়সলের কার্যাবলী ভালো কি মন্দ তার দায়-দায়িত্ব অবশেষে আমার ওপর বর্তাবে কেন। একবার মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস প্রণয়নের জন্যে আমাকে ডাকা হল, আমি সে কাজে মদীনায় যাই। তিনি আমাকে ডেকেছেন তাই আমি তাঁর অতিথি হই। তিনবার রাবেতার সম্মেলনে যোগদান করি। তিনবারই রাবেতার অতিথি ছিলাম। এ সব কাজ যদি কারো দৃষ্টিতে পাপকার্য হয়ে থাকে তবে সে আমাকে গুনাহগার মনে করার ব্যাপারে স্বাধীন। থাকলো এ কথা যে, আপনি তাকে কেন উপদেশ দেননি? এ প্রশ্ন শুধু আমাকে করা হয় কেন? এ প্রশ্ন প্রত্যেক এমন আলেমকে করা উচিত যিনি হজ্জের জন্যে গিয়ে থাকেন। তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করুন যে, কারা কারা বাদশাহ ফয়সলকে উপদেশ দিয়ে এসেছে?

প্রাপক-
ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক
নিয়াজআবাদ, মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৬৫

১৮ সেপ্টেম্বর '৬৩

স্নেহবরেষু,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠির মাধ্যমে এ কথা জেনে খুশী হয়েছি যে, আপনি বর্তমানে জার্মানে লেখা পড়া করছেন। আল্লাহ আপনাকে বিদ্যা দান করুন এবং সঠিক পথেও

প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আপনি যখন এমন এক ভূ-খন্ডে অবস্থান করছেন যেখানে রয়েছে শিক্ষিত অমুসলিমরা এবং তাদের সাথে আপনার কথাবার্তা বলতে হয়, তখন আপনার উচিত কিছু না কিছু ইসলামী সাহিত্য নিজের সাথে রাখা এবং বড় বড় সমস্যার ব্যাপারে অন্ততঃ এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা, যাদ্বারা আপনি অমুসলমান এবং অনভিহিত মুসলমানদের সামনেও ইসলামকে তুলে ধরতে পারেন। অন্যথায় আগামী দিনে আপনাকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে এবং চিঠির মাধ্যমে একেকটি কথার জবাব পাওয়া মুশকিল হবে।

সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব লিখে দিচ্ছি :

একঃ কোনো জীবের ছবি ইসলামে নিষিদ্ধ। ছবিটি হাতে তৈরী হোক কিংবা ক্যামেরায় হোক। ছবিটি কোন প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়েছে ইসলামের আপত্তি তা নিয়ে নয়। বরং জীবের ছবিতেই ইসলামের আপত্তি। আরব দেশসমূহের লোকেরা ফটোকে জায়েয করে বড় ভুল করেছেন। আর এরই পরিণতিতে বর্তমানে সেখানে প্রতিকৃতি পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে। এবং প্রধান সড়ক সমূহে সেগুলো স্থাপিত হচ্ছে অথচ কোনো মুসলমান দেশে এরূপ হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত করা যেতো না।

দুইঃ ক্যামেলি প্ল্যানিং এর ওপর 'ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ' নামে আমার লেখা একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটি আপনার পড়া থাকলে এ বিষয়ে আলোচনা কারীদেরকে আপনি দাঁত ভাংগা জবাব দিতে পারতেন।

তিনঃ চার বিবাহ সম্পর্কে যারা আপত্তি করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তোমরা কি বাস্তবিকই এক বিয়ের (Monogamy) পক্ষপাতী। আর নাকি কোনো জাতির মধ্যে কখনো চার বিয়ে নীতির (Monogamous) প্রতিষ্ঠিত ছিল? তোমাদের এক বিবাহ প্রথা তো লোক দেখানো বিধিমাত্র। অন্যথায় তোমাদের অধিকাংশে বহু বিবাহের (Polygamous) বাস্তবায়নকারী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আইনগত বহু স্ত্রী প্রথা উত্তম নাকি বিধি বহির্ভূত প্রথা? বিধি বহির্ভূত অনেক স্ত্রী থাকার অনিবার্য ফল হলো কুমারী মাতা, জারজ সন্তান, অগণিত মহিলার অসহায়ত্ব বৃদ্ধি এবং মেয়েরা শুধুমাত্র পুরুষদের ভোগের উপকরণে পরিণত হয়।

আইনগতভাবে বহু স্ত্রী হলে তারা অবশ্যই একটি গন্ডীর মধ্যে থাকে। আর এ গন্ডীর মধ্যে একজন পুরুষ লোক যতোগুলো স্ত্রীই রাখুক না কেন সে স্ত্রী ও সন্তানদের দায়িত্বভার নিজ স্কন্ধে বহন করা ছাড়াই তাদেরকে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করতে পারবে না। অভিযোগকারী জার্মানীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের অতিরিক্ত মহিলা নাগরিকদের সমস্যার সমাধান অবশেষে তোমরা কিভাবে করেছ? তোমাদের দেশে যুদ্ধে লাখো পুরুষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে এবং

পুরুষের তুলনায় লক্ষ লক্ষ নারীর আধিক্য রয়েছে। আইনানুগ এক বিবাহ প্রথা দিয়ে তোমরা এ সমস্যার কিভাবে সমাধান করবে?

যে পাদ্রী নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহের ওপর অভিযোগ করেছে তাকে আপনি যথোপযোগী জবাব দিতে পারতেন যদি আপনি আমার লেখা সূরায়ে আহযাবের তাফসীর পড়তেন। এ প্রসঙ্গটি সেখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আপনি অস্ত্র ছাড়া দুশমনের সাথে লড়ছেন। এ কারণে আপনি এবং আপনার সঙ্গী সাথীরা অযথা হয়রান হচ্ছেন।

চারঃ প্রস্রাবের পর এস্তেঞ্জার জন্যে কাগজই যথেষ্ট। অবশ্য পায়খানার পর শৌচ কর্ম করার জন্যে পানি না পেলে কাগজ দিয়েই প্রাথমিক শুষ্ক পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর কাগজের ২/৪ টুকরা পানিতে ভিজায়ে কয়েকবার পরিষ্কার করে নেবেন।

পাঁচঃ যদি সময় মত নামায পড়ার সুযোগ আদৌ না হয় তবে জোহর ও আছর একত্রে পড়ে নেবেন। এমনিভাবে মাগরিব ও এশা। এর নিয়ম এই যে, জোহরের শেষ সময় আর আছরের সূচনা লগ্নে উভয় নামাযের শুধু ফরয রাকাত একত্রে আদায় করে নেবেন। এমনিভাবে মাগরিবের শেষ ও এশায় প্রথম সময়ে এ উভয় নামাযের কেবল মাত্র ফরয রাকায়াত আদায় করে নিতে হবে। তবে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। কেবল মাত্র প্রয়োজনের সময়ই এরূপ আমল করবে।

ছয়ঃ আপনি খাদ্যের মধ্যে শুধু ডিম, মাছ, ও তরিতরকারী খাবেন। এ কথা আমি বুঝি না মাখন ও পনিরের মধ্যে শূকর কিভাবে মিশ্রিত হয়? যা হোক আপনি কোনো ষ্টোরে গিয়ে জেনে নেবেন যে, খাঁটি গাওয়া মাখন পাওয়া যায় কিনা?

সাতঃ ঠান্ডা যতো তীব্রই হোক না কেন আল কোহলের ব্যবহার প্রয়োজন নেই, জায়েজও নেই। এর পরিবর্তে আপনারা কফি ব্যবহার করতে পারেন।

প্রাপক—
সাইয়েদ মমতাজ আখতার,
জার্মানী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৬৬

১৮ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আপনার চিঠি পেয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখা এবং স্বয়ং আমার ঘরেরও মহিলাদের পোশাক না শরীয়ত বহির্ভূত না পাশ্চাত্য অনুকৃত। অবশ্য আমাদের গ্রামাঞ্চলও পুরাতন ধাঁচের মহিলারা নিজেদের পোশাককেই শরয়ী পোশাক মনে করে থাকেন। শহরে মহিলাদের ব্যবহৃত যে কোনো পোশাক অথবা পাঞ্জাবেরা বহিরাগতদের প্রচলিত সকল পোশাককেই তারা পাশ্চাত্য ফেশন অথবা শরীয়াত বহির্ভূত পোশাক মনে করে থাকে। এ ধরনের গোঁড়ামীর অবশ্যই অপনোদন হওয়া উচিত। শরীয়াতের আহকামের ভিত্তিতেই কোনো পোশাক শরয়ী হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। কোনো বিশেষ এলাকার প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে নয়। আমাদের এখানকার মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে যাদের আপত্তি আছে তারা বলুন যে, তাদের মতে এর কোন জিনিসটি শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রাপক–
হাকীম মুহাম্মদ হাসান,
হোমিও ডাক্তার, শুজা আবাদ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৬৭

১৮ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি হস্তগত হয়েছে। আপনি যে আলেম সাহেবের চিঠির উদ্ধৃতি পাঠিয়েছেন স্বয়ং সে উদ্ধৃতি দিয়েই আপনি অনুমান করতে পারবেন যে, তাদের মধ্যে ইনসাফের পরিমাণ কতোটা কম, বরং তিরোহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন– একটি জামায়াত (অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী) আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আপন অবস্থান থেকে সরে আসাকে মর্যাদাহানিকর মনে করে। অন্য কথায় তার উদ্দেশ্য এই যে, ভর্ৎসনা, অপবাদ, মিথ্যারোপ এবং দিবা–নিশি অহর্নিশ বিরোধী প্রোপাগান্ডার ওপর যদি আমরা ধৈর্য ধারণ করি, জাবাবে যদি গালী গালাজ না করি, কোনো অপবাদ যদি না দেই, প্রোপাগান্ডার কোনো গুরত্বই যদি না দেই তবে এটাই আত্মসম্মান বজায় রাখা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে ওসব মিথ্যাবাদী গালিবাজ

বিরোধীদের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে থাকতে হবে। অতপর তিনি বলেন– অন্য একটি জামায়াত (অর্থাৎ মৌলভী গোলাম গাওস সাহেবের জমিউতুল ওলামা) বিতর্কিত বিষয়ের ওপর মৌন থাকাকে শরীয়তের ইযযতের খেলাফ মনে করে। এ কথা তো একজন আল্লাভীরু দ্বীনী আলেমের কলমের মাথায় আসতে পারে না। তবে এমন ব্যক্তির কলম দিয়ে অবশ্যই বের হতে পারে যে নিজেই দলভিত্তিক গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে গেছে। ঐ আলেম সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করুন যে, শাহে সউদের মারফত আমেরিকা থেকে তেইশ লাখ টাকা গ্রহণের যে সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ আমার ওপর দেয়া হয়েছে তা কি শরীয়তের মান, মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে? ঘটনা এই যে, আলেম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা প্রকাশ্য মিথ্যার বেসাতি করে বেড়ায় এবং নৈতিকতার সমস্ত সীমা লংঘন করে প্রকাশ্য গালি–গালাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে আমি ভদ্রলোকই মনে করি না। দ্বীনের কোনো ব্যাপারে তাদের সাথে এক হওয়া জায়েয মনে করা তো দূরেরই কথা, এ সব লোক নিজেদের এবং দ্বীনের ইযযতের দুশমন হয়ে গেছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনে চায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা তারা করতে থাকুক। অবশেষে তারা নিজেরাই অবগত হবে যে, তারা দ্বীনের ইযযতের খেদমত করেছে নাকি নিজেদের ইযযত হারিয়ে ফেলেছে। আমি আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে, আমি এ সব লোকদের সাথে কথা–বার্তা বলতে চাই না। বাকী রইলো মুখলিস আলেমগণ। তারা তো বরাবরই জামায়াতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন এবং ইনশাআল্লাহ জামায়াতে তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

প্রাপক–
মাওলানা রাহাত গুল সাহেব,
আকুড়াহ খাটক।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৬৮

২১ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। সূরায়ে নূরের তাফসীরে আমি যা কিছু লিখেছি তাতে আপনি সন্তুষ্ট না হলে যা আপনি সঠিক বুঝেন তাই বুঝতে থাকুন। আমার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেক লোক গ্রহণ করবে তা জরুরী নয়। বাকী রইলো সে কথা যা আমি

লিখেছি। আমার লেখার বিশুদ্ধতার ওপর আমি পূর্ণ আস্থাবান। কিন্তু আমার হাতে এতো সময় নেই যে, একেকটি বিষয় নিয়ে লোকদের সাথে আলোচনা করি।[১]

প্রাপক- খাকসার,
ইবনে বশীর দেহলভী, আবুল আ'লা
মুলতান।

পত্র — ৬৯

২৫ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। যেসব লোক অভিযোগ করার রোগে আক্রান্ত তারা প্রত্যেক সম্ভাব্য পন্থায়ই অভিযোগ খুঁজে বের করতে থাকে। এমন লোকদের জবাব শেষ পর্যন্ত কতটুকু দেয়া যায়?

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা পিড়ীত লোকদের সাহার্য্যার্থে পশ্চিম পাকিস্তানের সব অঞ্চলের লোকদের কাছ থেকে সাহার্য তোলা হয়েছে। দেড় লক্ষ টাকা এবং হাজার হাজার টাকার সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। এখন যদি আমরা জনগণের কাছে হিসেব দেই যে, জনগণের দেয়া অর্থ এভাবে খরচ করা হয়েছ তবে এ সব লোক এটাকে ঢোল পিটানো বলে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যদি আমরা নীরব থাকি এবং কোনো হিসেব পত্র না দেই তবে এরাই বলে যে, সমস্ত টাকা ও সামগ্রী জামায়াতে ইসলামী হজম করে ফেলেছে; হিসেব পর্যন্ত দেয়নি।

জামায়াতের প্রত্যেকটি লোক সাপ্তাহিক কর্মী বৈঠকে যে রিপোর্ট পেশ করে সেটা সম্পর্কেও তারা একই মন্তব্য করে থাকে। রিপোর্টের উদ্দেশ্য হলো একেকজন কর্মীর কাজের হিসেব নিকেশ করা। যে কর্মীর কাজে অলসতা পরিলক্ষিত হয় তা

---

১. সূরায় নূরের ১১ আয়াতের ১০ পাদটীকায় ইফকের ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত মুহতারাম মাওলানা দলীল পেশ করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না। আল্লাহ্‌ যা জানাতেন তাই জানতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহর (রাঃ) ব্যাপারে এক মাস পর্যন্ত তাঁর যে পেরেশানী ছিল তা থেকে দলীল পেশ করেন। পত্র লেখক এ বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। তার ধারণা মতে হযরত আয়েশার (রাঃ) ব্যাপারটি সম্পর্কে রাসূল জানতেন। কিন্তু তিনি মংগলার্থে তা গোপন রাখেন। (সংকলক)

দূর করা। অধিকন্তু জামায়াত সরাসরি জানতে থাকে যে, কর্মীগণ কোনো কাজ করছে কি করছে না। যদি করে তবে কি কাজ করছে এমন জিনিসকে কোনো বদখেয়াল লোক রিয়াও সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, যে আল্লাহ রিয়াকে খারাপ বলছেন সে আল্লাহ বদখেয়াল করতেও নিষেধ করেছেন।

প্রশিক্ষণ সম্মেলনে তাহাযযুদ ও নফল ইবাদাতের গুরত্ব এ উদ্দেশ্যে দেয়া হয় যে, জামায়াতের কর্মীগণ যেন এগুলোর প্রতি অভ্যস্ত হয়। এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা হলে এ সব দোষ অন্বেষণকারী হুজুরগণ এটাকে রিয়া বলে থাকেন। চেষ্টা না করা হলে এ সব লোকেরাই চর্চা করতেন যে, জামায়াতে ইসলামী নিছক একটি রাজনৈতিক দল। আধ্যাত্মিকতার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার ধারণা এই যে, দ্বীনদারীর দাবীদার কোনো মহল যখন অন্যের দোষ অন্বেষণ এবং নেককে বদ বানানোর প্রচেষ্টায় এরূপ নিমজ্জিত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। নিজের এবং তার বিষয়টি আল্লার উপর সোপর্দ করে নিজের কাজে নিবিড় থাকাই কর্তব্য। সকল হারজিৎ এ দুনিয়ায় না হওয়া উচিত। আখিরাত কারো স্বরণ থাকুক কিংবা না থাকুক তা আসবেই। সে সময় প্রত্যেকে নিজের হিসেব নিজেকেই দিতে হবে। যদি আমরা রিয়া করে থাকি তবে আমাদের কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এ সব লোক যদি হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে অথবা সে-ই ফেরকাগত গোঁড়ামীর ভিত্তিতে আমাদের দোষ রটনা করে থাকে তবে তারা নিজেদের পরিণাম নিজেরাই দেখতে পাবে।

প্রাপক–
মাওলানা সায়াদুদ্দীন সাহেব,
মর্দান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭০

৯ অক্টোবর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ঈমানদারীসহ ওকালতির ব্যবসা করা সম্ভব নয়। আপনার কাছে জীবিকার্জনের অন্য একটি উপায় আছে। তাপর জেনে শুনে একটি না জায়েজ জীবিকার্জনের উপায় গ্রহণ না করা উচিত। ১

১. কেউ যদি অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে ঈমানদারীর

একজন শিয়া যদি হানাফী অংশীদারদের সাথে শরিক হয়ে কুরবানী করতে চায় তবে এতে ইসলামে কোনো নিষেধ নেই।

প্রাপক– খাকসার,
চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার সাহেব, আবুল আ'লা
চক সাইয়েদ, মালেকওয়াল, জিলা- গুজরাত।

পত্র— ৭১

৫ অক্টোবর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পত্র পেয়েছি। আমি যে কথা বলেছি তা এই যে, যদি ইসলামের কোনো আইন কিংবা হুকুম মান্য করতে এমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যা দূর করা অসম্ভব। তবে সে আইন অথবা হুকুম ঐ অসুবিধা দূর না হওয়া পর্যন্ত মুলতবী থাকবে। এমনিভাবে কোনো আইন অথবা হুকুম কোনো বিশেষ অবস্থায় পালন করতে গেলে যদি কোনো বড় ধরনের ক্ষতির সৃষ্টি হয় এবং সে ক্ষতিটা শরীয়তের দৃষ্টিতেও ক্ষতিকর সে অবস্থায়ও হুকুম পালন থেকে বিরত থাকা চাই। এর কতিপয় উদাহরণ আমি আমার আলোচ্য নিবন্ধে লিখেছি। এ কথা আমি একাকী লিখছি না বরং এর আগে কতিপয় ফকীহও একথা বলেছেন। ১

প্রাপক– খাকসার,
জনাব ওলী হাসান সাহেব, আবুল আ'লা
টুলকী, লিয়াকত আবাদ, করাচী।

সাথে ওকালতী পেশা গ্রহণ করে তবে মুহতারাম মাওলানার মতে পাকিস্তানী আদালতে এ পেশা জায়েব। (সংকলক)

১. দ্রষ্টব্যঃ তরজমানুল কুরআনঃ জুলাই ১৯৫৯ শিরোনামঃ "হিকমতে আমলী আওর এখতিয়ার আহওয়ানুল বালিয়্যাতাইন।"

পত্র— ৭২

১২ অক্টোবর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। মাকামে ইবরাহীমের জন্যে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি সে স্থানেই নামায আদায় করতেন এবং এখান থেকেই জামায়াতের ইমামতি করতেন। এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম অন্য কোনো স্থানে দাঁড়ালে নামায হবে না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইমামতির জন্যে এ জায়গাটি উত্তম। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানেই দাঁড়ায়ে নামায আদায় করতেন এবং আল্লার ফরমান রয়েছে ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ۔

এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, আজকাল যে স্থানটিকে মাকামে ইবরাহীম বলা হয় তা প্রকৃত মাকামে ইবরাহীম নয়। বরং তা কাবা ঘরের প্রাচীর সংলগ্ন। যে পাথরটি মাকামে ইব্রাহীমে রাখা হয়েছে তা প্রথমে কাবার প্রাচীর সংলগ্ন রাখা ছিল। হযরত ওমরের (রাঃ) মাসনামলে পাথরটিকে সেখান থেকে সরিয়ে তার আসল বর্তমান স্থানে রাখা হয়।

প্রাপক-
আব্দুল আহাদ সাহেব,
পেশাওয়ার।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৩

১৪ অক্টোবর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে ধর্ম প্রচারের অধিকার দেয়ার তাৎপর্য এই যে, একজন অমুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে । নিজের ধর্ম সম্পর্কে বই-পুস্তক প্রণয়ন এবং সাময়িকী প্রকাশ করতে পারবে। কেননা স্বধর্মীয়দেরকে আপন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার অধিকার তার আছে। পরন্তু সে কেন ইসলাম গ্রহণ করছে না তারও বিবৃতি দিতে পারে। আইনের গন্ডীর ভিতরে অবস্থান

করতঃ ইসলাম গ্রহণ না করার কারণসমূহ এবং নিজের সন্দেহ সমূহ বর্ণনা করার অধিকার তার আছে।

প্রাপক–
ডাঃ আব্দুল খালেক সাহেব,
মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৪

২০ নভেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার বিস্তারিত চিঠি পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমি অনুসারীদের সংখ্যা কম বেশী হওয়াকে নবীর কৃতকার্য ও অকৃতকার্য হওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্থ করিনি। বরং এ কথা বলেছি যে, ১৩ বছরের মক্কী জীবনে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে কোন বস্তু মুনাফেক সুলভ ঈমান গ্রহণের জন্যে বাধ্য করতে পারতো? হিযরতের পর থেকে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত যে নাজুক অবস্থার মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের কাজ চলে সে অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামদের একনিষ্ঠ নির্ভেজাল ঈমান ছাড়া জিহাদে সফলকাম হওয়া কিভাবে সম্ভব হতো। এ কারণে আহলে বাইয়াত ও গুটি কতক সাহাবা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত সাহাবাকে মুনাফেক সাব্যস্থ করা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা।

ঈমানদারীর সাথে যদি আপনি কিছু করলে শুধু এতোটুকু করতে পারেন যে, খেলাফতের ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবা নিজেদের ইজতেহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেটাকে আপনি ভুল মনে করলে ভুল বলে ঘোষণা করে দিন এবং আপনার মতে যেটা সঠিক সেটাকেই সঠিক ও শুদ্ধ বলুন। কিন্তু ঈমান আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারীদের নিয়াতের ওপর হামলা করা এবং তাঁদের ঈমানকে অস্বীকার নিতান্তই ঔদ্ধত্য। এমন কথার অভ্যাসকারীর আল্লার গ্রেফতারীর ভয় করা উচিত।

প্রাপক–
সাইয়েদ মুহাম্মদ মহীউদ্দীন হোসনী সাহেব,
পীর এলাহী বখশ কলোনী, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৫

২২ নভেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। শূরার সদস্য নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়নি। নির্ভরযোগ্য লোকদের পরামর্শ গ্রহণের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র। সময়ের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত লোকেরা (আহলুর রায়) নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন যদ্বারা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হওয়ার আশা করা যাবে। আপনার ১ ও ২ নং প্রশ্নের জবাব এটাই। ৩ নং প্রশ্নের জবাব এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ আমরণ খলীফা ছিলেন। কিন্তু এটা কোনো শরয়ী হুকুম নয় যে, এরূপ থাকা অপরিহার্য।

আমর কর্তৃক শাসনামল নির্দিষ্ট করাটা শরয়ী হুকুম বিরোধী নয়।

প্রাপক–
মুহাম্মদ ইবরাহিম কামেরপুরী,
পাতুকী, জিলা–লাহোর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৬

৭ নভেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আমার সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্যিকারভাবে এ সুধারণার উপযুক্ত বানিয়ে দিন এবং সত্য দ্বীনের অধিকতর খেদমত করার শক্তি দান করুন।

প্রাপক –
আহমদ ফকীর সাহেব,
মেমন গেষ্ট হাউস, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৭

৭ নভেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। একজন কাদিয়ানীর সাথে একজন মুসলমান মেয়ের বিবাহ হতে পারে না। যদি আপনার বিবাহ কাদিয়ানী মহিলার সাথে হয়ে থাকে তবে এ সমস্যার সমাধান একটিই। আর সেটা এই যে, আপনার স্ত্রী কাদিয়ানী আকীদা পরিত্যাগ করে তওবা করবেন অন্যথায় বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রাপক–
মুহাম্মদ আসলাম ভাট্টি সাহেব,
সারগোধা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৮

২১ সেপ্টেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি নিজেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, একদিকে বদ ওলামা অন্যদিকে মাশায়েখে দুনিয়া দ্বারা কি কাজ নেয়া হচ্ছে। আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি যে, আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে নিজের কাজ করে যাবো। এখন হক্কানী আলেম এবং সত্যনিষ্ঠ তরীকতপন্থীগণের কাজ হলো সত্যকে বুলন্দ করার জন্যে একত্রিত হওয়া। আল্লার ফজলে সত্যাশ্রয়ী লোকের সংখ্যা এখনো কম নয়। জরুরী শুধু তাদেরকে এক ও একত্রিত হওয়া।

প্রাপক–
পীর বেলায়েত মুহাম্মদ সাহেব,
রজুয়াহ শরীফ, (হাজারাহ)।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৭৯

৩ নভেম্বর '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। দ্বীনি আহকামের প্রতিটি অংশের হিকমত ও প্রয়োজনীয়তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। তাহলে তো এ প্রশ্নও করা যায় যে,

নামাযে কপাল যমীনে না লাগালে তাতে কি কম হয়ে যাবে এবং রোযা মাগরিবের দু'মিনিট আগে ভাংগলে তাতে কি ক্ষতি হয়ে যাবে।

দুইঃ যদি আপনি এ কথায় সন্তুষ্ট হোন যে, একজন নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁর সাহায্যকারীরা সকলেই (তাঁর আহ্‌লে বাইয়াত এবং অপর চার পাঁচ জন ছাড়া) মুনাফিক হয়ে থাকলে তাতে নবীর কিছুই আঁসে যায় না, তবে আপনি আপনার ধারণা পরিহার করতে থাকুন। কিন্তু আপনার কাছে এ কথার জবাব কি যে, মক্কার ১৩ বৎসর এবং মদীনার প্রথম ৮ বছরে রাসূলের নিকট পরিশেষে কোন উপকরণ ছিল যার কারণে সমগ্র সাহাবারা তাঁর সাথে মুনাফেক আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল? এবং এ সব মুনফিকীদেরকে সাথে করেই তিনি কাফেরদের মুকাবিলা করতঃ ক্রমাগত কামিয়াব হন? এ সব ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করার পরিবর্তে আপনি নিজেই-চিন্তা-ভাবনা করতে থাকুন এবং আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি যে কথায় প্রবোধ মানে সেটাকে গ্রহণ করতে থাকুন।

প্রাপক—
শের মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব,
পাক পত্তন, জিলা- মন্টোগ্রামী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৮০

২ নভেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,
আসসালাম আলাইকম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার সহানুভূতিমূলক পয়গামের জন্যে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই আল্লার ওপর ভরসা করে কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা নিজেদেরকে তাঁর ওপর সোপর্দ করে দিয়েছি। তবে আমাদেরকে সত্যের জন্যে কাজ করতে হবে এবং এ পথে যা কিছুই বাধা বিপত্তি আসবে তজ্জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। যে মরহুমের কুরবাণী আল্লাহ্ কবুল করেছেন তিনি আমাদের ঈর্ষার কারণ। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সত্য পথে জীবন উৎসর্গ করার তৌফিক দান করুন। ১

প্রাপক—
নূর মুহাম্মদ সাহেব,
ঢাকা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

১. ১৯৬৩ সনের অক্টোবর মাসে লাহোরের ভাটি দরজায় অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে গুন্ডা বাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয়। সম্মেলনে

পত্র— ৮১

৩ নভেম্বর '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। আমার ব্যাখ্যায় আপনার ভুলের অপনোদনের কথা জানতে পেরে খুশী হলাম। যারা নেক নিয়তসহ শুধুমাত্র অজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে আসছে তদের সকলের ভুল বুঝার অবসান এ ব্যাখ্যা দ্বারা ঘটবে ইনশা আল্লাহ।

প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের সাথে আমার সম্পর্ক শরীরের সাথে অপরাপর অংশের মতই। শরীরের কোনো অংশকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা যেমনি অসহনীয় তেমনি কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতা বরদাশত করা আমার জন্যে কঠিন। কিন্তু শরীয়াত ও নৈতিকতার সীমায় অবস্থান করেই নিজ শরীরের হেফাজত করা জরুরী মনে করি। একইভাবে এর হেফাজতের জন্য আমি বুদ্ধিমত্তা ও কলা–কৌশল অবলম্বন করবো, মূর্খের মতো কোনো কাজ করবোনা।

ভূতপূর্ব জম্মু ও কাশ্মীর সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা (তারা এখন আযাদ কাশ্মীর কিংবা অধিকৃত কাশ্মীরের যেখানেই যাক না কেন) নিজেদেরকে ভারতের জবর দখল থেকে মুক্ত করার জন্যে জিহাদ করবে, এটাকে কোনো অবস্থাতেই শরীয়াতসম্মত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে অস্বীকার করা যায় না। তাদের এই অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। পাকিস্তান কারো সাথে কোনো বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হলে সেটা অনুসরণ করা তাদের জন্যে (কাশ্মীরবাসীদের জন্যে) শরীয়ত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিধিবদ্ধ নয়।

অধিকন্তু পাকিস্তানী লোকদের জন্যেও শরীয়ত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ জায়েয যে, তারা নিজেদের কাশ্মিরী ভাইদেরকে এ কাজে সর্বোত্তভাবে সাহায্য করবে। অবশ্য বাস্তবে যুদ্ধ করা অথবা না করার ব্যাপারে পাকিস্তানীগণ নিজেদের সরকারকে মান্য করবে। সরকার যুদ্ধ করলে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। আর সরকার যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলে আমাদেরও বিরত থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক

পিতার তৃতীয় আঘাতে আল্লাহ বখশ নামে একজন রোকন শাহাদাত বরণ করেন। পত্র লিখক সমবেদনা, সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ করে মাওলানা সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখেন।

সম্পর্কসমূহের মধ্যে ইসলাম আমাদেরকে ওসব চুক্তিপত্র সমূহ অনুসরণ করতে বাধ্য করে যেগুলো আমাদের জাতি নিজ সরকারের সহায়তায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সাথে সম্পন্ন করেছে।

প্রাপক–
এ, আর, কায়ছার সাহেব,
চীফ অর্গেনাইজার, হাই কমান কাশ্মীর,
জিহাদ কাউন্সিল, কামরুল মুজাহেদীন পেশাওয়ার।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৮২

২৬ ডিসেম্বর '৬৩

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আপনি যেসব অভিযোগ করেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, ইসলামের নীতির সাথে যতোটুকু সম্পর্ক তাতে আমি উভয় বিষয়ে সব সময় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। যেমন আমার রচিত 'ইসলামী রিয়াসাত' বইখানি অধ্যয়ন করলে এ বিষয়ে আপনার ধরণা সুস্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেশের সাংবিধানিক বিষয়ে ঐ সব নীতিমালার স্বীকৃতি গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধীরে ধীরে কাজ করাকেই আমি অধিকতর সংগত মনে করি। কারণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সমস্ত কথা একই সময় গ্রহণ করানোর জন্যে যথোপযোগী হয় না। যে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে শতকরা একভাগও অর্জন করা যায় না শতকরা একশ ভাগ হাসিল করার জন্যে এমন চাপ সৃষ্টি করা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ নয়। বরং এমনটি করলে এর ফল উল্টো দাঁড়াবে এবং আমাদের ওপর এর অশুভ পরিণতির শিকার হওয়ার আশংকা থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা অমুসলমানদেরকে মূলতঃ ভোটাধিকার না দেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করি তাহলে তাতে সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এর ফল এ দাঁড়াবে যে, আমাদের ওপর যুক্ত নির্বাচন চেপে বসবে যার পরিণতিতে কখনো অমুসলমানদের ভোটাধিকার খর্ব করা তো দূরের কথা এখানে ইসলামী রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনাটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমনি করে একটি মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে কুফরী মতবাদ প্রচারের অধিকারকে আমরা যদি এখনই বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করি তাহলে এ সময় তা বন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে এখান থেকে আন্দোলনের সুযোগটাই বন্ধ হয়ে যাবে। এ সব কারণে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে স্তরে স্তরে অগ্রসর হওয়া অধিক

যুক্তিসংগত মনে করি। আপনি যদি এ থেকে এরূপ অর্থ করেন যে, আমরা মূলতঃ ইসলামী শাসনতন্ত্র চাই না তবে আপনার বলায় ও চিন্তায় আপনাকে বাধা দিতে পারে কে।

তাসাউফের ব্যাপারে আমার লেখার ওপর আপনি যে আপত্তি করেছেন তাতে বুঝা যায় যে, আপনার মতে মানুষের জন্যে দু'টি প্রান্তিকের কোনো একটিতে যাওয়া জরুরী। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব এবং হযরত শাহ সাহেবের সমস্ত কার্যাবলীর হয় কঠোর সমালোচনা করতে হবে আদাজল খেয়ে অথবা তাদের সমুদয় কাজকর্ম করাকে এমন নিষ্কলুষ ও নিখুঁত ঘোষণা করতে হবে যার মধ্যে কোনো দিক থেকেই খুঁত ও ত্রুটির লেশমাত্র নেই। থাকলো এ কথা যে, মানুষ সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বীকৃতি দেবে সাথে সাথে ত্রুটি সমূহের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করবে। এ নীতিগত পন্থা তো আপনার মস্তিষ্ক গ্রহণ করে না। এমতাবস্থায় আপনিই বলুন যে, আমি কিভাবে আপনাকে প্রবোধ দিতে পারি।

প্রাপক–
এস, এম, ইলিয়াস,
কালেমন্ডি, মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৮৩

১৯ ফেব্রুয়ারী '৬৮

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, সম্ভবত আপনার এ ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে যে, হযরত খালিদ (রাঃ) ওহুদ পাহাড়ের পেছন থেকে ঘুরে এসে ঐ সময় আক্রমণ করেন যখন পাহাড়ের উপত্যকায় নিয়োজিত তীরন্দাজ সেনাদেরকে গণী–মাতের মাল আহরণের জন্যে উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে দেখেন। এ কারণেই আপনি হিসেব কষে দেখেছেন যে, এতোটুকু বিলম্বে খালিদের (রাঃ) সৈন্যবাহিনী ঘুরে আসতে পারবে কি পারবে না। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেখানে রণকৌশল (Strategy) এটাই হতে পারতো যে, কূরাইশগণ সামনে থেকে যুদ্ধ করতো আর তাদের একাংশ ওহুদের পেছন দিক থেকে মুসলমানদের পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করতো, এ জন্যে তারা সে অংশকে প্রথমেই ওহুদের পেছন দিকে পাঠিয়ে দেয় যাতে করে সুযোগ পেলেই পেছন থেকে তারা আক্রমণ করতে পারে। এ দূরদর্শীতার কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের আগেই উপত্যকায়

তীরন্দাজদেরকে মোতায়েন করেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল আমাদের পরাজয় হলেও তোমরা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করবেন।

প্রাপক-
নেসার আহমদ কোরাইশী সাহেব।
ব্রিগেডিয়ার (অবসর প্রাপ্ত) শিয়ালকোট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৮৪

৩০ ডিসেম্বর '৬৩

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এবং পিকথলের তর্জমাকে একত্রিত করে পড়লে ইনশাআল্লাহ কুরআনের তাৎপর্য বুঝতে সহজ হবে। মুহাম্মদ আলী লাহোরী আহমদী ফেরকার লোক ছিল। তার তর্জমা ও তাফসীর গোমরাহী থেকে পবিত্র নয়। এ কারণে কুরআনের তাৎপর্য অনুসন্ধানীর জন্যে এটা নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রাপক-
বাবুদ্দীন সাহেব,
মীরপুর খাছ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৮৫

৪ জানুয়ারী '৬৪

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি বদ-দোয়া বা মোবাহিলার যে পদ্ধতি লিখেছেন এরূপ দোয়া কিংবা বদ-দোয়ার দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের ফায়সালা করা যায় না, বরং ফায়সালা করতে হবে বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে । আবু জাহেলের উপমা প্রত্যেক লোকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তার ওপর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সত্যকে পূর্ণভাবে পেশ করে প্রমাণ সম্পন্ন করেছেন এবং সে নবীর সাথে সর্ব প্রকারের অসৎ আচরণ করতঃ নিজকে আল্লাহর রোষানলে দগ্ধীভূত হওয়ার উপযোগী বানিয়ে নেয়। যদি সে নিজের জন্যে এ শর্তযুক্ত দোয়া নাও করতো তবুও তার ওপর আল্লার গযব অবতীর্ণ হত। যদি কেউ আপনার লেখা অনুযায়ী নিজের

জন্যে বদ দোয়া করে তবে সে নিজের দোয়া মোতাবেক মরতেই হবে এটা জরুরী নয়। তার মরে যাওয়া না ইসলাম সত্য হওয়ার দলীল হবে এবং তার মরে না যাওয়া না ইসলাম বাতিল হওয়ার দলীল।

প্রাপক–
শেখ মুহাম্মদ হানীফ
টেক্সটাইল মিলস, লায়ালপুর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৮৬

৫ নভেম্বর '৮৪

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি কয়েক মাস আগে কারাগারে আমার কাছে আসে। কিন্তু বন্দীশালার সেন্সরশিপের বিধি- নিষেধের কারণে আমি মূলতঃ চিঠি-পত্র লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ কারণে অন্য অসংখ্য চিঠির মত আপনার চিঠিরও জবাব দেইনি। এখন আপনার পত্রের সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি এতে আপনার সামনে আপনার বক্তব্যও থাকবে এবং সাথে আমার জবাবও।

আপনি যে পেরেশানীর কথা উল্লেখ করেছেন এর আসল কারণ এই যে, আপনি আল্লাহ'র কুদরত, ইলম ও হিকমতের দাবীসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির পরিবর্তে পারস্পরিক বৈপরিত্য অনুসন্ধানের চিন্তায় লিপ্ত আছেন। এ চিন্তা আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে যেখানে ওগুলোর কোনো একটিকে অস্বীকার করা ছাড়া আপনার আর কোনো গত্যন্তর নেই। আপনি কখনো এ বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এ পৃথিবীতে অন্যায় আছে, আছে শয়তান। কুফর, শির্ক, নাস্তিক্যবাদ ও অন্যান্য আকীদাগত গুমরাহী আছে। চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুটতরাজ, ব্যাভিচার, সমকামীতা ইত্যাদি সহস্র প্রকার নৈতিক অধঃগতি সম্পন্ন কাজ অহরহ চলছে। নেক কাজের মুকাবিলায় অসৎ শক্তি চারিদিকে প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে কাজ করে যাচ্ছে। এ অশুভ শক্তির বদৌলতে নানা প্রকারের অত্যাচার অবিচার আত্মপ্রকাশ করছে। প্রশ্ন হলো যে পৃথিবীতে কোনো মন্দ বা খারাপের অস্তিত্ব না হত বরং কেবল মাত্র ভালো আর ভালোই হত; এমন ধরনের পৃথিবী সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লার ছিল কি ছিল না। যদি তিনি এরূপ করার ক্ষমতা রাখেন তবে তাঁর এরূপ না করাকে (আল্লার কাছে ক্ষমা চাই) হিকমত, ন্যায় পরায়ণতা এবং কল্যাণ থেকে খালী প্রতীয়মান করা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই। আর যদি তিনি এরূপ করার ক্ষমতা না রাখেন তবে আপনার দলীলের ধরন অনুযায়ী আল্লাহ অবশ্যই

আপারগ ও অক্ষম হওয়া প্রতীয়মান হয়। তর্কশাস্ত্রের এরূপ প্রয়োগের অনিবার্য ফল এই যে, সে মানুষকে আল্লার গুণাবলীর মধ্যে সুসামঞ্জস্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে অসামঞ্জস্য তালাশের দিকে নিয়ে যায়। আমি এর বিপরীত সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি এবং এটা বুঝাতে চেয়েছি যে, আল্লার সৃষ্ট দুনিয়াতে মন্দের প্রাদুর্ভাব দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়। বরঞ্চ তাঁর হিকমতের ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনি যখন পৃথিবীর নিয়ম নীতি এভাবে তৈরী করেছেন তখন এরূপ নীতির সৃষ্টি হবে এটাই হিকমতের দাবী এবং এ ছাড়া দোষমুক্ত অন্য কোনো নিয়ম নীতি তৈরী করা হিকমতের বিপরীত হত। আমার এ বর্ণনা ধারায় আপনি তৃপ্ত না হলে দু'টি অবস্থার একটি আপনি গ্রহণ করবেন। হয় আপনি সামঞ্জস্যতর অন্য কোনো উত্তম পন্থার প্রস্তাবনা করে আমাকে পথ নির্দেশনা দেবেন। অথবা আল্লাহ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, আল্লার কুদরত অথবা হিকমত আছে কি নেই?

প্রাপক–
ফজলুর রহমান সাহিত্যিক,
মুসা লাইন, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র— ৮৭

২১ নভেম্বর '৬৪

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আল্লার যমীনে আল্লার আইন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের পথ থেকে বর্তমান এনায়কত্ব হটানো ছাড়া এ উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। এ সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে সহায়তা করা ছাড়া এক নায়কত্ব হটানোর আর অন্য কোনো বাস্তব পন্থা নেই। এ সময়ে যদি তৃতীয় একজন প্রার্থীকে প্রেসিডেন্টের জন্যে দাঁড় করনো হয় তবে এটা প্রকৃতপক্ষে আইউব খানকে একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখারই প্রচেষ্টা হবে।

প্রাপক–
কাযী নসীর আহমদ সাহেব,
নারুওয়াল।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৮৮

২১ নভেম্বর'৬৪

শ্রদ্ধেয়,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার পেশকৃত প্রস্তাব শরীয়াতের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। আমরা অবৈধ পন্থার জয়কে পরাজয় এবং বৈধ উপায়ের পরাজয়কে জয় মনে করে থাকি। জাল ভোট গ্রহণ করা অথবা টাকা দিয়ে ভোট কেনা এ দেশের জন্যে এমন ধ্বংসাত্মক যেমন ক্ষতিকর একনায়কত্ব। এ পন্থায় যারা নির্বাচনে জয়লাভ করবে তাদের দ্বারা কোনো সংস্কার ও কল্যাণধর্মী কাজ হতে পারে না।

প্রাপক–
আবু নোমান
শিয়ালকোট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র– ৮৯

৩১ অক্টোবর '৬৪

শ্রদ্ধেয়,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আমাদের মতে যুলুম ও স্বৈরাচারী নীতির প্রচলন থাকা মস্তবড় গুনাহ। এর পরিবর্তনের জন্য একজন মহিলার নেতৃত্ব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় যদি না থাকে তবে তা হবে একটি বড় বিপদকে দূর করার জন্যে ছোট বিপদের সাহায্য গ্রহণ করা, যার অনুমোদন শরীয়াতে আছে।

প্রাপক–
আবদুল হাই সাহেব,
সুলতান পুর, আজমগড়, ইণ্ডিয়া।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—৯০

১৬ ডিসেম্বর '৬৪

শ্রদ্ধেয়,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অনেক দিন আগেই আপনার চিঠি এসেছে। কিন্তু আজকাল আমি এতো ব্যস্ততার মধ্যে আছি যে, চিঠি পড়াও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মাসায়েলের ওপর বিস্তারিত পত্র আদান-প্রদান তো দূরের কথা, আমি আমার একটি বক্তৃতা ডাকযোগে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি এ চিঠির আগেই পেয়ে থাকবেন। বক্তৃতাটি পাঠে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ভালো করে জানতে পারবেন।

প্রসিডেন্ট আইউবের স্বৈরতন্ত্রে এ পর্যন্ত পাকিস্তানী লোকদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি। আমি এটাও অবগত আছি, যদি এ স্বৈরতন্ত্র আগামী দিনের জন্যে মজবুত হয়ে যায়, তবে আরো কত কি ক্ষতি সাধন করবে। এমতাবস্থায় আল্লার দরবারে আমার মাথায় এ দায়িত্ব নিয়ে হাজির হওয়া সম্ভব নয় যে, আমার কোনো কাজের দরুন এ স্বৈরতন্ত্র দেশে পুনরায় চেপে বসবে। আমার বিশ্বাস, যদি এ নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন না করা হয় তবে এ একনায়ক পুনরায় জাতির ওপর চেপে বসবে। তার চেপে বসা আমার মতে একজন মহিলাকে নেতা বানানোর চেয়ে অন্ততঃ দশ গুণ বেশী বড় অপরাধ।

মোট কথা আল্লার দরবারে এ কথার দায়িত্বভার গ্রহণ করার শক্তি আমার নেই যে, আমার কোনো ভুলের কারণে আইউব খানের স্বৈরাচার এদেশে আবার জয়লাভ করুক।

প্রাপক—
আমীনুল হাসান রিজভী সাহেব, লণ্ডন
সায়ীদ আহেম সাহেব, মুলতান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র– ৯১

৭ ফেব্রুয়ারী '৬৫

মুহতারানী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি বিষয়টি ভালো করে না বুঝেই তার ওপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এ নয় যে, আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। এটা মনে করে আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। বরং তদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ইসলামের রাস্তার একটি বড় প্রতিবন্ধক অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্র হটানোর যা কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে চেষ্টা করে দেখিয়ে দেয়া। যদি এ স্বৈরতন্ত্র দূর হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েম হতো তাহলে ইসলামের জন্য কাজ করা তুলনামূলকভাবে কষ্ট কম হতো। কিন্তু যার ভিত্তিতে এ একনায়ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন জাতির তা পসন্দনীয় ছিল না। জয়লাভ হয়েছে সরাসরি জোর যুলুম ও কারচুপির ভিত্তিতে। এদ্বারা জাতির অনুপযুক্ততা প্রমাণিত হয় না।

প্রাপক–
কাজী আলী মুহাম্মদ সাহেব,
ডাক্তার–দারুসসালাম সাম ররিয়াল, শিয়ালকোট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ৯২

৭ জানুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। বর্তমানে ব্যাপক ও বিশ্লেষণধর্মী জবাব দেয়ার অবকাশ আমার নেই। সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে হারাম মাস সমূহের হুরমতের হুকুম আরব উপদ্বীপের জন্যে এবং সেই সময়ের জন্য ছিল, যখন সেখানে গোত্রীয় বিবাদ–বিসংবাদ বর্তমান ছিল। ছিল গোত্রীয় নেতৃত্ব। আইন প্রয়োগ করার কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। ইসলামের প্রথম যুগে যখন আরববাসীগণ মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব করতেন তখনো এ হুকুম প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন সমগ্র আরব মুসলমান হয়ে যায় তখন এ হুকুম স্বতই রহিত

হয়ে যায়। কেননা, ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করার পর তাদের ওপর অন্য একটি বিরাট হুকুম অর্থাৎ অন্যায়ভাবে মুসলমান হত্যার ব্যাপারে নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়। অন্যথায় হারাম মাসগুলোর হারাম হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকার অর্থ এ হতো যে, আরব সম্প্রদায় শুধুমাত্র চার মাস ঝগড়া থেকে বিরত থাকবে, আর বাদবাকী দিনগুলোতে তারা ঝগড়া করতে পারবে।

এ হুকুম আরব উপদ্বীপের জন্যে এবং ইসলামের সূচনাযুগ পর্যন্ত সীমিত থাকার একটি বড় প্রমাণ এই যে, আরব উপদ্বীপের লোকেরা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানেরা কেবলমাত্র উপদ্বীপের বাইরে কাফেরদের সাথে (বৈধভাবে) যে কোনো সময় লড়াই করতে পারতো। সাহাবাদের থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কোন আলেম সে লড়াইয়ের ব্যাপারে নিষিদ্ধ মাসের প্রশ্ন করেননি। কাফেররা তো যুদ্ধের আগে নিষিদ্ধ মাসের প্রতি লক্ষ্য রাখতো না। কিন্তু স্বয়ং মুসলমানগণও কাফেরদের ওপর আক্রমণ করার সময় এ কথার খেয়াল করেনি যে, নিষিদ্ধ মাসে আক্রমণ করছি না তো? আমার জানা মতে কোন ফকীহও এর ওপর আপত্তি উত্থাপন করেননি।

প্রাপক–
ওবাইদুল্লাহ কূটী, গোলকাদাহ,
দেওবন্দ, ভারত।

খাকসার,
আবুল আ'লা,

পত্র– ৯৩

৭ জানুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাউকেও তাগুত হওয়ার জন্যে প্রথমত তার নিজেকেই বিদ্রোহী হওয়া শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ঃ শুধুমাত্র পূজিত হওয়াই নয়। বরং ঐ পূজা অর্চনার মধ্যে তার নিজস্ব প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার দখলও থাকতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়—তাগুত সে ব্যক্তি যে আল্লার মুকাবিলায় কেবল মাত্র বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তার বিদ্রোহের সীমা এতোটুকু পর্যন্ত গিয়ে পৌছে যে, সে আল্লার পরিবর্তে নিজকে মানুষের রব ও ইলাহ বানানোর চেষ্টা

করেছ। এ অর্থের প্রেক্ষাপটে প্রতিমাসমূহ অথবা মৃত্যুর পর যেসব বুযর্গদের প্রতিমা বানানো হয়েছে তাদের ওপর তাগুত শব্দটি প্রযোজ্য হবে না।

প্রাপক–
নূর ইলাহী সাহেব,
গুজরাট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র– ৯৪

৭ জানুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার কথা আমার ভালো ভাবেই স্মরণ আছে। যদি আপনি পরিচয় না দিতেন তবুও শুধু নামেই আপনাকে চিনে নিতাম। আপনি ভালো আছেন এবং দিল্লীতে অবস্থান করছেন জেনে খুশী হয়েছি। আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব নিম্নে দেয়া গেলঃ

একঃ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ উভয় কিরআতই প্রমাণ ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য ক্বারীগণ কর্তৃক বর্ণিত আছে। উভয় কিরআতই সঠিক ও নির্ভুল। অর্থের দিক থেকেও কোনো ত্রুটি নেই। আল্লাহ্ তায়ালাই মালিক ও বাদশাহ। তবে এ তথ্য আজ অনুদঘাটিত। আখিরাতে এর পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে। সেখানে তাঁর মালিক ও বাদশাহ্ হওয়ার বিষয়টা সকলের সম্মুখে দিবালোকের মতো উন্মোচিত হয়ে যাবে।

দুইঃ মুতাশাবিহাত শব্দটি মুহকামাত শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। ফিকাহ্‌বিদগণ মুতাশাবাহের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করছেনঃ

ما لا يبقى ظاهره عن مراده অর্থাৎ দৃশ্যতঃ শব্দ দ্বারা যার সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা যায় না। আমি এ সংজ্ঞাটিরই তাৎপর্য এভাবে ব্যক্ত করেছি যে, "সেসব আয়াত যেগুলোর অর্থের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে"। এর অর্থ এ নয় যে, আমি মুতাশাবিহাতকে মুশতাবিহাত (সন্দেহজনক) মনে

করেছি। আপনি তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের ওপর লিখা আমার পুরা পাদটীকা পাঠ করলেই দাবী সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জ্ঞাত হবেন।[১]

তিন ঃ ও চার ঃ সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাহিনীর উভয় স্থানে আমি যে তর্জমা করেছি তা আপনি তর্জমানুল কুরআনের ভলিউম ৬১-এর ১ম সংখ্যায় দেখতে পারেন। আমি উভয়ের তর্জমা ও তাফসীর করতে গিয়ে সাধারণ মুফাসসিরদের সাথে মত পার্থক্য করেছি কি?[২]

প্রাপক–
রহম আলী হাশেমী সাহেব,
দিল্লী, ভারত।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৯৫

২৬ জানুযারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। এটা জেনে সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমেরিকায় অবস্থান করে এবং চাকুরীর জন্যে কাফেরদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার প্রকৃতি অবলোকন করে আপনার দীনি চেতনা জাগ্রত হয়েছে। আপনি সেখানে একজন মুসলমানের প্রকৃত কর্তব্যের সাথে পরিচিত হয়ে তা প্রতিপালন করতে শুরু করেছেন। আল্লাহ্ আপনার নিজেকে সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং অন্যদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করানোর জন্যে অধিক থেকে অধিকতর তৌফিক দান করুন।

যে মহিলা আপনার প্রচেষ্টায় মুসলমান হয়েছে তার ব্যাপারটি একটু জটিল। এটা তো ইসলামের একটি সুস্পষ্ট বিধান যে, একজন মুসলমান মহিলা অমুসলমানের স্ত্রী হয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু কাফিরদের দেশে যেখানে

---

১. তাফহীমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, সূরায়ে আলে-ইমরানের আয়াতঃ ৭, টীকাঃ ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা সোয়াদ ,আয়াতঃ ৩২, ৩৩ , টীকা ৩৫ ।

তাদের নিজস্ব সরকার আছে এবং যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা আটায় লবণের মত অতি নগণ্য সেখানে যদি কোন বিবাহিতা মহিলা মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফির থাকে তবে আইন তাকে সাহায্য করতে পারে না। আর আইনের আশ্রয় ছাড়াও ঐ মহিলা পুরুষ লোকটির সংগ ত্যাগ করতে পারে না। এমতাবস্থায় এ মহিলার প্রসংগটি ওসব মুসলমান মহিলাদের প্রসংগের সাথে তুলনা করা হবে যারা হিজরতের আগে মক্কা শরীফে মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু তাদের স্বামীরা মুসলমান হয়নি। ওসব অসহায় মহিলাদেরকে নিজেদের কাফির স্বামীদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তায়ালা তাদের নিষ্কৃতির কোন পথ খুলে দিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অপারগতার অবস্থা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে মহিলা স্বামীর এমন প্রত্যেক ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রতিবাদ করার দরকার যেখানে স্বামীর দাবী শরীয়তের সাথে দ্বন্দ্বমুখর যেমন ঃ

এক ঃ নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করতে এবং পর পুরুষদের সাথে নৃত্য করতে অস্বীকার করতে হবে। অবশ্য নিজের ঘরে একাকী অবস্থায় স্বামী তার সাথে নাচতে চাইলে তা কবুল করা উচিত।

দুই ঃ নিজের পোশাক পরিবর্তন করে ঘাড় থেকে গোড়ালী পর্যন্ত এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

তিন ঃ যদি স্বামী শূকরের মাংস ভক্ষণ করে তবে তা সহ্য করতে হবে। কিন্তু নিজের পানাহারের পাত্র সমূহ আলাদা করে রাখা দরকার।

চার ঃ যদি স্বামী সন্তানদেরকে গির্জায় নিয়ে যায় তবে তাতে বাধা দেয়া উচিত নয়। কিন্তু সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের মন-মগজে ইসলামী আকায়েদ ও ধারণাসমূহ মোহরাঙ্কিত করার চেষ্টা করতে হবে।

পাঁচ ঃ নিজের চাল-চলন, আমল-আখলাক এবং কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে স্বামীর মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে যে, উভয়ের মধ্যে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য পরিষ্কার হওয়ার পর আগের মত প্রেম প্রীতি অবশিষ্ট নেই। আগের ভালোবাসা কেবলমাত্র তখনই ফিরে আসতে পারে যখন স্বামীও ইসলাম কবুল করবেন।

উপরোল্লেখিত কথাগুলোর ফলশ্রুতি এটাও হতে পারে যে, স্বামীও বুদ্ধিমানের মতো নিবিড়ভাবে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করবে। আর আপনিও হেদায়াত ও সংশোধনের একটা সুযোগ পেয়ে যাবেন। কিংবা তিনিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেই পৃথক হওয়ার জন্যে তৈরী হবেন এবং এ পৃথকীকরণ কোন উত্তম সমঝোতার সাথে হতে পারবে। দ্বিতীয় অবস্থার সৃষ্টি হলে একজন নারীকে ধৈর্য সহকারে তা কবুল করা দরকার। আল্লার ওপর পূর্ণ ভরসা থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ যেন কোন ভালো মুসলমান স্বামী যোগাড় করে দেন।

আপনার অন্যান্য প্রশ্নাবলীর উত্তর নিম্নরূপঃ

একঃ রামাদানে যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া ব্যতীত সেহেরী খেতে না পারেন তবে সেহেরী ছাড়াই রোযা রাখতে হবে। এমতাবস্থায় ফজরের নামাযের সময় রোযার নিয়ত করে নিতে হবে।

দুইঃ হায়েজ অবস্থায় নামায রোযা উভয় ত্যাগ করতে হবে। নামায কাযা করতে হবে না। অবশ্য পরে রোযা কাযা করতে হবে। হায়েজ অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ না করা উচিত। অবশ্য মুখস্থ থাকলে তা পড়া যায়।

তিনঃ পর্দার ব্যাপারে আপনি অন্ততঃ এতোটুকু সাবধানতা অবলম্বন করুন যে, মেয়েটিকে শিক্ষা দেয়ার সময় তার চেহারার দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ না করুন। যদি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে দীর্ঘক্ষণ সে দিকে তাকাবেন না। পরন্তু একাকী অবস্থায় তার সাথে না বসতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষা দেয়ার সময় টুকুই তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

ইবাদাত ও ফিক্হী মাসায়েল সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব প্রণীত "বেহেশতী জেওর" এবং মাওলানা আবদুশ শাকুর লক্ষণভী সাহেবের "ইলমুল ফিক্হ" আপনার জন্যে ফলদায়ক হবে। উভয় কিতাবের পূর্ণ সেট যোগাড় করে নিবেন। হাদীসের কিতাবের মধ্যে আপনি রিয়াজুস সালেহীনের উর্দূ তর্জমা, ইমাম বোখারীর আল–আদাবুল মুফরাদ উর্দূ তর্জমা এবং মাওলানা বদরে আলম সাহেবের তর্জমাতুস সুন্নাহ যোগাড় করে নেবেন; জানিনা আমাদের সাহিত্য আপনার নজরে পড়েছে কিনা? আমাদের ইসলাম পরিচিতি এবং তার ইংরেজী অনুবাদ, তাফহীমুল কুরআন, খুতবাত ও অন্যান্য

উর্দূ ইংরেজী সাহিত্য আপনার কাজে আপনাকে অনেক সহযোগিতা করতে পারে।

প্রাপক–
সাইয়েদ আজহার আলী সাহেব,
আমেরিকা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র–৯৬

২৬ জানুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমার অনুপস্থিতিতে আপনার চিঠি এখানে এসে জবাবের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন আমি প্রত্যাবর্তন করে জবাব দিচ্ছি ঃ

এক ঃ সূরায়ে নাযেয়াতের কসম সমূহের যেসব বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তন্মধ্যে যে ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হয়েছে তা এই যে, এখানে শপথ করা হয়েছে ফেরেশতাদের নামে। এরপর যার ওপর শপথ করা হয়েছে তা হল কিয়ামতের আবির্ভাব এবং মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম। النازعات غرقا দ্বারা ওসব ফেরেশতা উদ্দেশ্য যারা রগ–রেষায় ঢুকে আত্মা টেনে হিচড়ে বের করে।

الناشطات نشطا দ্বারা ইশারা করা হচ্ছে যে, তারা জান বের করে এক জগত থেকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। السابحات سبحا দ্বারা আল্লাহর আহকাম পালনার্থে তৎপরতা বুঝানো উদ্দেশ্যে। আগের তাৎপর্য আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

দুইঃ نفاثات বহু বচন এক বচনে نَفَّاثَة - نَفَّامَة عَلَّامَة এর মত মোবালাগাহ্ (আধিক্য) অর্থবোধক। শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লিংগের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে। একবচনের عُقْدَة বহুবচন হল عُقَد যাদুকরেরা যে গিট বাঁধে عقد দ্বারা সেগুলোই উদ্দেশ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ফলে মক্কা শরীফে যারা মুসলমান হল তাদের বংশীয় লোকেরা রাসূলের চির শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সর্বাবস্থায় তাঁর ক্ষতি করার চিন্তায় মগ্ন থাকে। কেউ রাতের আঁধারে তাঁকে গুপ্তহত্যার

পরিকল্পনা করে। কেউ নিজের জাহেলী পদ্ধতি মোতাবেক যাদু করে তাঁকে ভস্ম করে দেয়ার কল্পনা করে। আবার কেউ নিজের মনের জ্বালা অন্য উপায়ে মেটানোর চিন্তায় বিভোর ছিল। আদেশ হল–এ সব কিছুর মুকাবিলায় আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ চিন্তামুক্ত হয়ে যাও।

তিন ঃ সূরায়ে মুযাম্মিলের দু'টি অংশ। ১৯ আয়াত পর্যন্ত প্রথম অংশ। আর ২০ থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশের বিষয়বস্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এটা সে সময়ের কথা যখন মক্কা মোয়াজ্জমায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্যন্ত হয়নি বরং বিরোধিতা চরম আকারে ছিল। অধিকন্তু এ সময় পর্যন্ত কুরআনেরও একটি নির্ভরযোগ্য অংশ নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশের বিষয়বস্তুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ অংশ মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছে। কেননা মক্কায় আল্লার কিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধ করার প্রশ্নই ছিল না।

প্রাপক–
মুহাম্মদ ফারুক সাহেব,
রামপুর, ইণ্ডিয়া।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ৯৭

২৭ জানুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি, আপনার বর্ণিত প্রথম তিনটি আয়াতে জগত সৃষ্টির তিনটি বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে বৈপরিত্য নেই; বরং ধারাবাহিকতা আছে। প্রথমতঃ সমগ্র সৃষ্ট জগতের সৃষ্টিগত উপাদান ধুম্রাকারে ছড়ানো ছিল। তারপর আল্লার আদেশে একত্রিত হয়ে একটি বালির টিলায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা সেটাকে ফাটিয়ে আসমান ও যমিন তৈরি করেন। যমিনে প্রথমতঃ পানি আর পানিই ছিল, আর আল্লার রাজত্ব এ পানির ওপরই ছিল। পরে আল্লাহ্ তায়ালা এ পানি থেকে উদ্ভিদ ও জীব–জন্তু তৈরি করেন।

হযরত আদমের (আঃ) ফযীলতও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যেও কোনো বৈপরিত্য নেই। হযরত আদমের (আঃ) মর্যাদা এ কারণেও যে, তাঁকে আল্লাহ্ স্বহস্তে বানিয়েছেন। তার ফজীলতের কারণ এটাও যে, আল্লাহ তার মধ্যে নিজের বিশেষ রূহ দিয়েছেন। এবং এ কারণেও যে আল্লাহ্ তাঁকে এমন বিদ্যা দান করেছেন যা ফেরেশতাগণ জানত না।

প্রাপক–
মুহাম্মদ রফিক সাহেব,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৯৮

২৭ জানুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আমি ছবি উঠানো জায়েয মনে করি না এবং ইচ্ছা করে কখনো ছবি উঠাইনি। লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে যদি ফটো উঠিয়ে নিয়ে ছাপিয়ে দেয় তবে তাদেরকে বাধা দেয়ার মত আমার কাছে কোনো উপায় নেই।

প্রাপক–
আহমদ খান খাকী,
জান্দান ওয়ালা, জিলা–মিয়ানওয়ালী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ৯৯

১৭ ফেব্রুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, ঈমান ছাড়া কোনো আমল নেক আমল নয়। ঈমান

ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বেহেশতের দাবী করতে পারে না। কোনো কাফেরের জন্যে বড়জোর যে অনুকম্পার আশা করা যেতে পারে। তা শুধু এতোটুকু যে, যদি সে নৈতিকতার দিক থেকে ফাসিক না হয় বরং তার কার্যাবলী স্বচ্চরিত্র মূলক হয় তবে তাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে না যা ঐ কাফেরকে দেয়া হবে যে কাফের তো আছেই আবার দুশ্চরিত্রও। কিন্তু কুফরীর শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না।

প্রাপক–
সাইয়েদ মাহমুদ সাহেব,
হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র–১০০

৭ ফেব্রুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। এটা জেনে আন্তরিকভাবে খুশী হয়েছি যে, আপনি নিজের ধ্যানে যথারীতি মগ্ন আছেন এবং একটি হোস্টেল তৈরি করে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। হোস্টেলের পরিকল্পনা খুব ভাল। আমাদের শিক্ষাগারগুলোতে শিক্ষার যে ত্রুটি পাওয়া যায় তার অনেক তদারকী এ ধরনের হোস্টেলের মাধ্যমে করা যায়। এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করুন যে, ছাত্রগণ যেন শুধুমাত্র হোস্টেলের আইন কানুনের ভয়ে দ্বীনি জীবন যাপন করায় অভ্যস্থ না হয়। বরং তাদের ধ্যান–ধারণায় প্রকৃত পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং তারা নিজেরাই ইসলামী জীবন পদ্ধতি, ইবাদাতের অনুসরণ এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণকে পসন্দ করতে থাকে। এ জন্যে সুশিক্ষায় শিক্ষিত লোক এবং উন্নত চরিত্রবান অভিভাবকেরপ্রয়োজন।

প্রাপক–
চৌধুরী নিয়াজ আলী খান সাহেব,
জাওহারাবাদ, [illegible]।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র—১০১

১১ ফেব্রুয়ারী, ৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। কুরআন যে আল্লার কিতাব এ সত্য সুস্পষ্টভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অধিকাংশ আয়াতেই বলা হয়েছে ঃ "এটা আল্লার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব।" কিন্তু কোনো কোনো আয়াত এমন আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ সম্বলিত হচ্ছে যদ্বারা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া একান্তভাবে প্রমাণিত হয়।

এ সব দলীলের শীর্ষে অবস্থান করছে কুরআনের সেই চ্যালেঞ্জ যা সন্দেহপোষণকারী ও অভিযোগকারীদেরকে দেয়া হয়েছিল। এতে তাদের বলা হয়েছিল, যদি তোমরা কুরআনকে কোনো মানুষের রচিত মনে কর তবে এর অনুরূপ কালাম রচনা করে দেখাও। এ চ্যালেঞ্জ সর্ব প্রথম সূরায়ে হুদের ১২ আয়াতে দেয়া হয় এবং বলা হয় ঃ "তারা কি বলে যে, এটা নবীর বানানো ? হে নবী তুমি বলে দাও। ভাল কথা। তা হলে তোমরা এর অনুরূপ ১০টি সূরা বানাও"। এ দলীলের সারমর্ম এই যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যদি এটা মানবীয় কালাম হয় তবে মানুষ অনুরূপ কথা তৈরি করতে সক্ষম হওয়া উচিত। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এটা রচনা করেছেন, তোমাদের এ দাবী কেবল মাত্র তখনই সঠিক হতে পারে যখন তোমরা অনুরূপ একটি কিতাব রচনা করে দেখাতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তোমরা সকলে মিলে এর অনুরূপ কালাম যখন পেশ করতে পারছ না। তখন এ কিতাব আল্লার পক্ষ থেকে অবশ্যই নাযিলকৃত। কাফেররা যখন এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারল না তখন সূরায়ে ইউনুসের ৩৮ আয়াতে দ্বিতীয় বার এর পুনরোল্লেখ হলো। "এরা কি বলে যে, এটা নবীর রচিত? (তাদেরকে) বল, যদি তোমরা নিজেদের অপবাদে সত্য হও তবে অনুরূপ একটি মাত্র সূরা রচনা করে দেখাও এবং আল্লাকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকা সম্ভব তাকে তাকে ডেকে সাহায্য গ্রহণ কর।" এরপর সূরায়ে ত্বাহার ৩৩–৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তারা কি বলে যে, তিনি এটা নিজে বানিয়েছেনঃ বরং তারা ঈমান রাখে না। যদি তারা সত্য হয় তবে অনুরূপ কালাম রচনা করে দেখিয়ে দিক।"

কুরআনকে আসমানী কিতাব হিসেবে অস্বীকারকারীদের এ চ্যালেঞ্জ মক্কী যুগেই করা হয়নি। বরং হিজরতের পর মদীনায়ও জোরেসোরে এ চ্যালেঞ্জের পুনরোল্লেখ হয়। মুশরিক ও 'আহলে কিতাব'দেরকে সম্বোধন করে সূরায়ে বাকারার ২৩ আয়াতে পুনরায় ঘোষণা করা হয় "আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ কিতাবের ওপর তোমাদের যদি সন্দেহ হয় তবে এর অনুরূপ একটি মাত্র সূরা রচনা কর, আল্লাকে ছেড়ে তোমাদের সমস্ত সাহায্যকারীদেরকে ডেকে লও; যদি তোমরা সত্য হও।" ইতিহাস সাক্ষী এবং স্বয়ং কুরআনের পুনঃ পুনঃ চ্যালেঞ্জ এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, বিরুদ্ধবাদীরা এর জবাব দানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের অক্ষম ও অসহায় মৌনতা কুরআন আসমানী কিতাব হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

কুরআনে তার নিজের আল্লার কালাম হওয়ার স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলিল হিসেবে অস্বীকারকারীদের সামনে যে জিনিস পেশ করে তা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির আগের জীবন পদ্ধতি। অতএব, সূরায়ে ইউনুসের ১৬টি আয়াতে রাসূলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। "বল। যদি আল্লার ইচ্ছা এটাই হত তবে আমি এ কুরআন তোমাদেরকে কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবর পর্যন্ত দিতেন না। পরিশেষে এর আগে আমি একটি সময় তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। তোমরা কি বুদ্ধি দিয়ে কাজ করনি।" মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কুরআন বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। এ ধারণা খণ্ডনে উক্ত আয়াতটি অপর একটি মজবুত দলিল। কুরআন তাঁর রচিত নয় বরং আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দাবীর সমর্থনে আয়াতটি একটি শক্তিশালী প্রমাণ। অন্যান্য সব দলিল তো তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী জিনিস। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জিন্দেগী তাদের সম্মুখের বাস্তব জিনিস ছিল। নবুয়াতের আগে তিনি পূর্ণ ৪০ বছর তাদের মধ্যেই অতিবাহিত করেন। তাদের শহরেই তার জন্ম। তাদের সামনেই তাঁর কৈশর জীবন কাটে, সে সমাজেই তিনি জোয়ান হন, মধ্যবর্তী বয়সে পৌছেন। থাকা-খাওয়া, মেলা-মেশা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, লেন-দেন, বিবাহ-শাদী মোট কথা সর্ববিধ সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল। তাঁর জীবনের

কোনো দিকই তাদের অগোচরে ছিল না। এরূপ জানা-শুনা, দেখা জিনিসের চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য আর কি হতে পারে।

তাঁর জীবনের দু'টি কথা সম্পূর্ণ প্রকাশ্য ছিল যা মক্কার প্রতিটি লোক জানতো।

একটি এই যে, নবুয়াত প্রাপ্তির আগে পূর্ণ ৪০ বছর জীবনে তিনি এমন কোনো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সংগ পাননি যদ্বারা এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে যে, নবুয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই সে অভিজ্ঞতার স্রোতস্বিনী তাঁর ভাষাতে প্রকাশ হ'তে শুরু হয়ে যায়। কুরআনের সূরাসমূহ যেগুলো পর্যায়ক্রমিক আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে, এর আগে কখনো সেসব বিষয়ে তাঁকে আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করতে এবং ওসব ধারণা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। ঘটনার গভীরতা এতোটুকু যে, পূর্ণ ৪০ বছর সময়ের মধ্যে তাঁর কোনো অন্তরংগ মিত্র এবং কোন নিকটাত্মীয় কখনো তাঁর কথায় এবং আচার-আচরণে এমন কোন জিনিস উপলব্ধি করেনি যাকে ঐ মস্তবড় দাওয়াতের ভূমিকা বলা যায়, যা তিনি চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পন করে হঠাৎ শুরু করে দেন। এটা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন তাঁর নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত জিনিস নয় বরং বাহির থেকে তাঁর কাছে আগত জিনিস। কেননা মানব মস্তিষ্ক নিজের বয়সের কোন স্তরেই এমন কোন বস্তু প্রকাশ করতে পারবে না যার লালন-পালন ও উন্নতির প্রকাশ্য চিহ্নসমূহ জীবনের এর আগের স্তরসমূহে পাওয়া না যায়। এ কারণেই মক্কার কোনো কোনো চতুর লোক যখন নিজেই উপলব্ধি করল যে, কুরআনকে তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত সৃষ্ট সাব্যস্ত করা একটি নিরর্থক প্রকাশ্য অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। অবশেষে তারা বলতে শুরু করল যে, এমন কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি মুহাম্মাদকে এ সব কথা শিখিয়ে দেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথা প্রথম কথার চেয়েও বেশী অনর্থক। কারণ মক্কা তো দূরের কথা সমগ্র আরব রাজ্যে এমন যোগ্য লোক ছিল না যার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলা যায় যে, এ লোকটি ঐ বাণীর রচয়িতা কিংবা রচয়িতা হতে পারে। এরূপ যোগ্যতাপূর্ণ লোক কোনো সমাজে কিভাবে গোপন থাকতে পারে?

দ্বিতীয় কথা যা তাঁর আগের জীবনে সম্পূর্ণ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট ছিল তা এই যে, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধোঁকাবাজী, শঠতা, কূটিলতা ইত্যাদি ধরনের অন্যান্য ত্রুটির সামান্যতম ছোঁয়াচ তাঁর পবিত্র জীবন চরিত্রে মুহূর্তের জন্যেও পাওয়া যায়নি। সমগ্র সমাজে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল কি যে

বলতে পারে যে, এ চল্লিশ বছরের সংমিশ্রিত সমাজে তাঁর অমুক ত্রুটির সাথে তার পরিচয় হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব লোকের তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে তারা তাঁকে অত্যন্ত সৎ, মহৎ, সত্যবাদী, বিমল ও নির্ভরযোগ মানুষ হিসেবেই জানতো। নবুয়াতের পাঁচ বছর আগে কা'বার পুনর্নির্মাণের সময় হজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে বসানোর ব্যাপার নিয়ে কুরইশদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক বিবাদ সংঘটিত হয়। তাতে সর্বসম্মতিক্রমে এ আপোষরফা হয় যে, আগামীকাল ভোরে হেরেম শরীফে যিনি প্রথম প্রবেশ করবেন তাকেই শালিশ মানা হবে। দ্বিতীয় দিন প্রথম প্রবেশকারী লোকটি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সকলে সমস্বরে বলে উঠলো "তিনি পরম সত্যবাদী, আমরা তাঁর কথায় রাজী, তিনি মুহাম্মাদ (সঃ)। এমনিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করার আগেই কুরাইশ গোত্রের সকল মানুষের জনাকীর্ণ সম্মেলন থেকে তাঁর 'আমীন' হওয়ার সাক্ষ্য নিয়ে নেন। সুতরাং এ ধারণা করার অবকাশ কোথায় যে, যে ব্যক্তি সারা জীবনে কোনো ক্ষুদ্র ব্যাপারেও মিথ্যা, জালিয়াতী, প্রবঞ্চনা করেননি, সে ব্যক্তি হঠাৎ এতো বড় মিথ্যা ও মস্তবড় জালিয়াতী ও প্রতারণা নিয়ে নিজের মনগড়া কিছু কথা রচনা করেন এবং রচিত কথাগুলো অত্যন্ত জোর দিয়ে ও চ্যালেঞ্জ সহকারে আল্লার প্রতি আরোপ করতে থাকবেন?

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেনঃ তাদের অনর্থক অপবাদের উত্তরে তাদেরকে বলে দিন, হে লোকেরা! জ্ঞান দিয়ে কিছু কাজ তো কর। আমি বহিরাগত কোনো আগন্তুক নই, এর আগে আমি তোমাদের মাঝেই জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেছি। আমার আগের জীবন প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা আমার থেকে এ আশা কিভাবে পোষণ করতে পার যে, আমি আল্লার শিক্ষা এবং তাঁর হুকুম ছাড়া এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি।

এ বিষয়টি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। যারা কুরআন আল্লার ওহী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে থেকে হঠাৎ তোমাদের কাছে উদয় হয়নি। বরং এ কুরআন নাযিল হওয়ার আগে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ছিলেন। নবুয়াত দাবীর এক দিন আগেও তোমরা কখনো তাঁর

মুখে এ ধরনের বাণী এবং এ বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিক বাণী শুনেছ কি? যদি না শুনে থাক এবং অবশ্যই শুননি তা হলে এ কথা কি তোমাদের জ্ঞানে সায় দেয় যে, কারো ভাষা, ধারণা, জ্ঞাত বিষয়সমূহ এবং চিন্তা ও বর্ণনা রীতিতে আচমকা এরূপ পরিবর্তন হতে পারে?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যান না। বরঞ্চ তোমাদের মধ্যেই মেলা-মেশা করেন। তোমরা তাঁর মুখে কুরআনও শ্রবণ কর আবার অন্যান্য কথাবার্তা, বক্তৃতা-বিবৃতিও শুনে থাক। কুরআনের বাণী ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ভাষা ও পদ্ধতির মধ্যে এমন সুস্পষ্ট পার্থক্য যে, কোনো একজন লোকের মধ্যে এরূপ দু'টি ভিন্নধর্মী বাকপদ্ধতি (Style) হতেই পারে না। এ পার্থক্য শুধুমাত্র সে আমলেই সুস্পষ্ট ছিল না যখন নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দেশের লোকদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। বরং আজও হাদীস গ্রন্থে তাঁর অগণিত কথা ও বক্তৃতা বিদ্যমান আছে। তাঁর ভাষা ও বাক পদ্ধতি কুরআনের ভাষা ও পদ্ধতি থেকে এতটুকু ভিন্নতর যে, ভাষা ও সাহিত্যের কোনো চুল চেরা সমালোচক এ কথা বলতে সাহস করবে না যে, এ উভয় বাণী একই ব্যক্তির হতে পারে।

সূরায়ে কাসাসের ছিয়াশি আয়াতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ ''তুমি কখনো এ কথার প্রার্থী ছিলে না যে, তোমার ওপর কিতাব নাযিল হোক। এটা তো শুধুমাত্র তোমার রবের মেহেরবাণীতে তোমার ওপর নাযিল হয়। এটা একটা তথ্য যে, রাসূলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষাকারীদের মধ্যে, তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য থেকে কেউ এটা বলতে পারেনি যে, তিনি প্রথম থেকেই নবী হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হেরাগুহার এ বৈপ্লবিক মুহূর্তের পর তাঁর মুখে আচমকা যে বিষয়বস্তু প্রসংগ ও ব্যাপার সমূহের সূচনা হয় সেগুলোর সম্পর্কে তাঁর মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। হঠাৎ কুরআনের আকারে তাঁর মুখে যে বিশেষ ধরনের ভাষা, শব্দ ও পরিভাষার ব্যবহার লোকেরা শুনতে লাগলো কেউ এর আগে তার ব্যবহার শুনেনি। তিনি কখনো ওয়ায করার জন্যে দাঁড়াননি। কখনো কোনো দাওয়াত ও আন্দোলনের ডাক দেননি। বরং তার কর্মতৎপরতায় কখনো এ ধারণা পর্যন্ত হয়নি যে, তিনি সামষ্টিক সমস্যা সমাধান অথবা ধর্মীয় কিংবা নৈতিক সংশোধনের জন্যে কোনো কাজ শুরু

করার চিন্তায় মগ্ন আছেন। এ বৈপ্লবিক মুহূর্তের একদিন আগ পর্যন্ত তাঁর জীবন একজন ব্যবসায়ীর মত ছিল যিনি সহজ সরলভাবে বৈধ পদ্ধতিতে জীবিকার্জন করেন। নিজের সন্তানদের সাথে হাসি-খুশী থাকেন। অতিথি পরায়ণতা, গরীবের সাহায্য, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। কখনো ইবাদাত করার জন্যে নির্জনে বসে যেতেন। এমন ব্যক্তির হঠাৎ একটি বিশ্বজনীন প্রকম্প সৃষ্টিকারী খেতাব নিয়ে দাঁড়ানো, একটি বৈপ্লবিক দাওয়াত শুরু করা, একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন এবং চিন্তা, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতির পদ্ধতি নিয়ে সামনে আসা এতো বড় পরিবর্তন যা মানব প্রকৃতি হিসেবে কোনো কৃত্রিমতা তৈরী এবং ইচ্ছার প্রচেষ্টার পরিণামে কখনো ঘটতে পারে না। কারণ তা হতে পারে কেবল ক্রমবিকাশ উন্নতির স্তরসমূহ অতিক্রম করার পরই। আর এ সব স্তর ওসব লোকের কাছে কখনো গোপন থাকতে পারে না যাদের মাঝে মানুষ দিবানিশি অহর্নিশি জীবন যাপন করে।

এরপর সূরায়ে আনকাবুতের ৪৮ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "তুমি তো এর আগে না কোনো কিতাব পড়েছ আর না নিজের হাতে লিখেছ। যদি এরূপ হতো তবে বাতিলপন্থীরা সন্দেহে পতিত হতে পারতো।" এ আয়াতে দলিলের ভিত্তি এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন। তাঁর দেশবাসী, আত্মীয়স্বজন যাদের মাঝে জন্মদিন থেকে বয়োপ্রাপ্ত পর্যন্ত তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় তারা সকলেই এ কথা খুব ভাল করে জানেন যে, তিনি সারাজীবনে না কোনো কিতাব পড়েছেন, না কখনো হাতে কলম নিয়েছেন। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ এটা এ কথার সুস্পষ্ট দলিল যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা, বিগত নবীদের জীবন চরিত প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস, ধর্মসমূহের আকীদা-বিশ্বাস এবং সভ্যতা, নৈতিকতা এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর এ উম্মী নবীর মুখে যে গভীর ও প্রশস্ত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে তা ওহীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি তাঁর হাতে-কলমে লেখা-পড়ার বিদ্যা থাকতো এবং লোকেরা তাঁকে বই-পুস্তক নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে দেখতো তবে বাতিলপন্থীদের সন্দেহ করার কিছুটা উপকরণ হতে পারতো যে, এ ইলম ওহীর মাধ্যমে মিলেনি বরং মেহনত ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা এমন কোনো সন্দেহের নাম মাত্র বুনিয়াদও অবশিষ্ট রাখেনি।

সূরায়ে ফোরকানে অস্বীকারকারীদের আরেকটি অভিযোগের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে এ কুরআন একটি মনগড়া জিনিস যা সে নিজেই বানিয়ে নেয় এবং অন্যান্য কিছু লোক তাঁকে এ কাজে সহায়তা করে। এটা জঘন্য মিথ্যা ও নেহায়েত অবিচারের কথা, যখন তারা বলে এটা প্রাচীন লোকদের লিখিত বস্তু যা এ লোকটি নকল করে সকাল-সন্ধ্যায় লোকদেরকে শুনায়। তাদেরকে বলে দিন—এ কুরআন তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমান ও যমীনের রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

বর্তমান যামানার পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরাও কুরআনের বিরুদ্ধে*এ একই অভিযোগ উত্থাপন করেছে। কিন্তু আশ্চর্য যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন শত্রুদের কেউ এ কথা বলেনি যে, তুমি শৈশবে 'বুহাইরা' পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়গুলো শিখে নিয়েছো। কেউ এ কথাও বলেনি যে, যুবক বয়সে যখন তুমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বহির্দেশে যাতায়াত করতে তখন খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং ইহুদী যুবকদের কাছ থেকে এ সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছো। কারণ এ সব বিদেশ ভ্রমণের অবস্থা সম্পর্কে তারা জ্ঞাত ছিল। এ সফর তাঁর একাকী ছিল না। কাফেলার সাথে তাঁর সফর ছিল। তারা এ কথা জানতো যে, তাঁর ওপর কিছু শিখে আসার অপবাদ দিলে আমাদের নিজেদের শহরের শত সহস্র লোকেরাই আমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলবে। তাছাড়া মক্কার প্রতিটি সাধারণ মানুষ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, যদি এ সব অভিজ্ঞতা তাঁর ১২/১৩ বছর বয়সে বোহাইরা থেকে লাভ হয়ে থাকে অথবা পঁচিশ বছর বয়স থেকে লাভ হতে থাকে তবে এ লোকটি তো, বাহিরে কোথাও ছিলেন না, আমাদের সাথেই তো বসবাস করে আসছেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর সমস্ত ইল্‌ম গোপন রাখার কারণ কি থাকতে পারে এবং দীর্ঘ সময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কখনো এমন একটি শব্দ বের হয়নি যা এ ধরনের ইলমের প্রতি ইংগিতবহ হতে পারে? এ কারণেই মক্কার কাফেররা এতোবড় জঘন্য মিথ্যা আরোপ করার সাহস করেনি। এবং তা পরবর্তীকালের নির্লজ্জ লোকদের জন্যে উন্মুক্ত রাখে। কাফেরদের নবুয়াতের পূর্ব কাজ সম্পর্কে কোনো কথা নেই। বরং নবুয়াত পরবর্তী সময় সম্পর্কেই তাদের বিরোধিতা। তাদের কথা ছিল এই যে, এ লোকটি নিরক্ষর। নিজে পড়া-শুনা করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রথমে সে কিছুই শিখেনি। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে এমন কোনো কথাও জানতো না, যা আজ তার মুখ দিয়ে বের হয়।

এখন সে এগুলো কোথেকে পেতে লাগলো? তার মূলধন আগেকার লোকদের কিতাব পত্র যা সে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে অনুবাদ ও কপি করিয়ে কারো সহায়তায় পড়িয়ে শ্রবণ করে সেগুলো মুখস্ত করে দিনের বেলায় আমাদেরকে শুনায়। রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, এ প্রসংগে তারা কতিপয় আহলে কিতাব লোকদের নামও উল্লেখ করে যারা লেখাপড়া জানতেন এবং মক্কায় বসবাস করতেন। অর্থাৎ আদ্দাস (হোবাইতিব বিন আবদুল উজ্জার মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস) ইয়াসার (আলা ইবনে হাজরামীর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস) জবর (আমের ইবনে রবীয়ার আযাদকৃত গোলাম)।

দৃশ্যতঃ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ মনে হয় ওহীর দাবী রদ করার জন্যে নবীর ইলমের উৎসকে কলুষিত করার চেয়ে বড় আর কোন অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? কিন্তু লোকেরা প্রথম দৃষ্টিতে এটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় যে, জবাবে মূলতঃ কোনো দলিল পেশ করা হয়নি। বরং শুধু এটা বলেই কথায় ইতি টানা হয়েছে যে, তোমরা সত্য ও বাস্তবতার ওপর অবিচার করছ, সুস্পষ্ট অন্যায়সূচক কথা বলছ, জঘন্য মিথ্যার বেসাতী নিয়ে ফিরছ। এটা ঐ আল্লার কালাম যিনি আসমান ও যমীনের রহস্য জানেন। এটা কি বিস্ময়কর কথা নয় যে, তীব্র প্রতিকূল পরিবেশে এমন জোরদার অভিযোগ করা হয় এবং তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যাত হয়? বাস্তবিকই এটা কি এমন তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন অভিযোগ ছিল যে, এর উত্তরে কেবলমাত্র "মিথ্যা ও যুলুম" বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল? পরিশেষে এ সংক্ষিপ্ত জবাবের পরও লোকদের কোনো বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট উত্তর দাবী না করার এবং নও-মুসলিমদের অন্তরে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার কারণ কি ছিল? বিরোধীদের মধ্য থেকে কারো এ কথা বলার সাহস হয়নি যে, দেখ! আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের কোনো সদুত্তর তাদের কাছে নেই। তারা শুধুমাত্র মিথ্যা ও যুলুম বলেই টালবাহানা করছে।

এ সমস্যার সমাধান আমরা ঐ পরিবেশ থেকে পেয়ে যাই, যে পরিবেশে ইসলাম বিরোধীগণ অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, মক্কার অত্যাচারী সর্দার যারা একেকজন মুসলমানকে মারধর করতো এবং উত্যক্ত করে বেড়াতো-তাদের জন্যে এটা মোটেই দুষ্কর ছিল না যে, যাদের সম্পর্কে তারা বলতো এরা পুরনো কিতাবের তর্জমা করে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে মুখস্থ করায়, তাদের ঘর এবং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

ঘরে অভিযান চালিয়ে তাদের ধারণামতে ঐ কাজের জন্যে যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল সেগুলোর সমস্ত স্তূপ বের করে জনগণের সামনে রাখতো। এ কাজের সময় তারা আশে পাশে লুকিয়ে থেকে অনেক লোককে ব্যাপারটা দেখিয়ে দিতে পারতোঃ এ দেখ, নবুয়াত তৈরির কারখানা। যারা বিলালকে উত্তপ্ত বালুতে পোড়াতো তাদের জন্য এভাবে নবুয়াতের কারখানা আবিষ্কার করার পিছনে কোনো আইন ও বিধানগত নিষেধ ছিল না। এরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা চিরদিনের জন্যে মুহাম্মাদী নবুয়াতের বিপদ ঠেকাতে পারতো। তা না করে তারা শুধুমাত্র মৌখিক অভিযোগ করতো। একদিনও এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে তৎপরতা দেখায়নি।

দ্বিতীয় কথা এই ছিল যে, এ ব্যাপারে তারা যাদের নাম নিতো তারা বহিরাগত ছিল না। তারা এ মক্কা নগরীরই অধিবাসী ছিল। তাদের যোগ্যতা কারো কাছে গোপন ছিল না। যার সামান্য জ্ঞান ছিল এমন প্রত্যেকটি লোক প্রত্যক্ষ করতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জিনিস পেশ করছে তা কোন্ পর্যায়ের, কোন্ মর্যাদার ভাষা, কোন্ পর্যায়ের সাহিত্য, ছন্দের প্রকরণ কি রকম, বিষয়বস্তু ও ধারণাসমূহ কত উচ্চাংগ। আর যাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাদের কাছ থেকে এ সব কিছু হাসিল করেছে তারা কোন্ পর্যায়ের লোক। এ কারণেই কেউ এ অভিযোগের কোনো গুরুত্ব দেয়নি, প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতো যে, এ সব কথাবার্তা শুধুমাত্র মনের ঝাল মিটানো বৈ আর কিছুই নয়। অন্যথায় এ সব কথার কোনোই মূল্য নেই। যারা ওসব লোকদের সম্পর্কে অনভিহিত ছিল তারাও তো পরিশেষে এতোটুকু কথা চিন্তা করতে পারতো যে, যদি এ সব লোক এতোই যোগ্যতা রাখে তবে তারা নিজেরা কেন নিজেদের বাতি জ্বালায় না? অন্য একজনের প্রদীপে তৈলের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন কেন? তাও আবার এমন গোপনে যে, এ কাজের খ্যাতিতে তাদের সামান্যতম অংশও মিলে না?

তৃতীয় কথা এই ছিল যে, এ প্রসংগে যাদের নাম নেয়া হয়েছিল তারা সকলেই বহিরাগত ক্রীতদাস যাদেরকে তাদের মুনিব মুক্ত করে দিয়েছিল। আরবের গোত্রীয় জীবনে কেউ কোনো শক্তি এবং গোত্রীয় সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে পারতো না। মুক্ত হওয়ার পরও ভৃত্যরা তাদের সাবেক প্রভুদের ছত্রছায়ায় থাকতো এবং পুরাতন প্রভুদের সহানুভূতিই সমাজে বসবাসের জন্যে সহায়ক হতো। এ কথা পরিষ্কার যে, (মায়াজাল্লাহ) যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সব লোকদের সহায়তায় মিথ্যা নবুয়াতের একটি দোকান চালাতেন তবে এ সব লোক একনিষ্ঠভাবে ও নেকনিয়তসহ এ ষড়যন্ত্রে তাঁর সাথে শরীক হতে পারতো না। অবশেষে এমন ধরনের লোক কিভাবে তাঁর নিকট একনিষ্ঠ সহকর্মী এবং সত্যিকার সহযোগী হতে পারে যাদের কাছ থেকে রাতের আঁধারে কিছু কথা শিখে দিনের আলোকে সমস্ত মানব মণ্ডলীর কাছে বলে বেড়ানো যে, এটা আল্লার পক্ষ থেকে আমার ওপর অবতীর্ণ ওহী। কারণ তাদের কেবল কোনো লোভ এবং স্বার্থের জন্যেই এ কাজে শরীক হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান লোক এ কথা স্বীকার করতে পারবে যে, এ সমস্ত লোক তাদের অভিভাবকদের অসন্তুষ্ট করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ষড়যন্ত্রে (!) শরীক হয়ে গেছে? সে স্বার্থটি কি হতে পারে যার পরিপ্রেক্ষিতে এ লোকগুলো এমন একজন লোকের সাথে মিলিত হয়েছে যে সমগ্র জাতির অভিশপ্ত, অভিযুক্ত এবং সকলের শত্রুতার কেন্দ্রবিন্দু? নিজেদের অভিভাবকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদনের কারণে যে ক্ষতি তাদের হবে তার পূরণ এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে আশা করা যায় কি, যিনি নিজেই মুসীবতে জর্জরিত? এটাও চিন্তার বিষয় যে, তাদেরকে মারধর করে এ ষড়যন্ত্র স্বীকার করিয়ে নেয়ার সুযোগও তাদের মনিবদের ছিলো। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা কেন করেননি এবং সমগ্র জাতির সামনে তাদের দ্বারা এ স্বীকারোক্তি কেন নেয়নি যে, আমাদের থেকে শিখে এ নবুয়াতের বাজার তিনি বসিয়েছেন?

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এ ছিল যে, তারা সকলেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলের পবিত্র সত্ত্বার ওপর যে আকীদা পোষণ করতেন সেরূপ অভূতপূর্ব আকীদা পোষণে তাঁরাও শামিল হয়ে যান। এটা কি সম্ভব যে, কৃত্রিম ও ষড়যন্ত্রমূলক নবুয়াতের ওপর যেসব লোক স্বয়ং ঈমান আনবে এবং অত্যন্ত গভীর বিশ্বাসসহ ঈমান আনবে যারা এ নবুয়াত তৈরীর ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছিল? যদি ধরে নেয়া যায় যে, এটাও সম্ভব, তবে ঈমানদারদের জামায়াতে তাদের তো একটা বিশেষ মর্যাদা থাকতো। এটা কেমন করে হয় যে, নবুয়াতের কারবার চললো আদ্দাস, ইয়াসার এবং জাবেরের সাহায্যে আর নবীর দক্ষিণ বাহুরূপে পরিগণিত হলেন আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ)।

উল্লেখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক শ্রবণকারীর দৃষ্টিতে এ অভিযোগটি নিজে নিজেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এ কারণে কুরআনে এ অভিযোগটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জবাবদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। বরং এ কথা বলার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেখ! সত্যের শত্রুতা করতে তারা কতটা অন্ধ হয়েছে এবং কত বড় মিথ্যা ও অবিচারের বেসাতিতে লিপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাপক–
শফীক বেরলভী,
সম্পাদক–খাতূনে পাকিস্তান, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১০২

১১ ফেব্রুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে খুব খুশী হয়েছি। শুধুমাত্র নেক স্বভাব ও প্রকৃতির কারণে আমেরিকায় অবস্থান করেও সেখানকার নৈতিক ও সামাজিক ত্রুটিসমূহের প্রভাব গ্রহণ করার পরিবর্তে আপনি তাদের ত্রুটিগুলো ঠিকমত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সে নিয়ামতের মূল্যায়ণ করেছেন যা ইসলামের বরকতে এ নাজুক অবস্থাতেও আমাদের মুসলমানদের লাভ হয়েছে। অন্যথায় সাধারণভাবে আমাদের যুবকরা ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে তো সেখানকার রূপ চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। আপনি নিজেও ভালো করে বুঝে নিন এবং অন্যান্য মুসলমান দেশ থেকে আগত যুবক —যাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয় তাদের মন-মানসে এ কথা ঢুকিয়ে দিন যে, ইউরোপ আমেরিকাতে আমাদের শুধু বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, তাদের নৈতিক দর্শন, জীবন পদ্ধতি এবং নীতিমালা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এ ব্যপারে ইসলাম থেকে আমরা যে হেদায়াত পেয়েছি তা কেবলমাত্র তুলনামূলকভাবে অধিকতর শ্রেষ্ঠই নয় বরং স্বয়ং পাশ্চাত্য-বাসীরাও যদি ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায় তবে তাদের আমাদের থেকে এ বিষয়ে পথ নির্দেশনা নিতে হবে।

আপনি ইসলামের সর্বোত্তম খেদমত এভাবে করতে পারেন যে, যে শিক্ষাই আপনি আমেরিকায় অর্জন করছেন তার সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন। তারপর পাশ্চাত্যবাসীদের যেখানে যেভাবেই তাদের কাছে আপনার কথা পৌঁছানোর সুযোগ হয় তাদেরকে এ কথা অবহিত করতে চেষ্টা করুন যে, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলাম মানব জীবনের সমস্যা সমূহের কি সমাধান পেশ করে।

আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন তার জবাব এইঃ

একঃ ঈসায়ীদের যবেহকৃত জন্তু হালাল নয়। কারণ তারা না সঠিক পদ্ধতিতে যবেহ করে যাতে জন্তুর শরীরের সমস্ত রক্ত বের হতে পারে, না যবেহের সময় আল্লার নাম স্মরণ করে থাকে। আপনি হয় ইহুদীদের জবেহকৃত জানোয়ার খাবেন নতুবা যদি নিজে জবেহ করার সুযোগ থাকে তবে নিজেই যবেহ করে নেবেন।[১]

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি আমার লিখিত "ইসলামে মুরতাদের শাস্তি" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন তাতে এ বিষয় সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত জ্ঞান লাভ হবে এবং সমস্ত অভিযোগের জবাবও পেয়ে যাবেন।

প্রাপক—
ডাঃ এস, মবিন আখতার সাহেব,
ইউ, এস, এ,

খাকসার,
আবুল আ'লা

---

১. ইহুদীরা এখনো আল্লার নাম নিয়ে জানোয়ার যবেহ করে এবং শূকরকে হারাম মনে করে থাকে। এ কারণে তাদের জবেহকৃত জানোয়ার মুসলমানদের জন্য জায়েয। এ গোশত 'শূরা' নামে আমেরিকা ও ইউরোপের [illegible] শহরে পাওয়া যায় যেখানে ইহুদী অধিবাসী আছে। (সংকলক)

পত্র— ১০৩

১৭ মার্চ '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। যেসব নির্দিষ্ট অপরাধে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে তারা সূরায়ে ফাতিরে উল্লেখিত সাধারণ অপরাধীদের থেকে ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ ঈমানদার গুনাহগারদের সম্পর্কে কথা এটাই যে, তাদের জাহান্নামে প্রবেশের পালা আসবে না। বরং তার থেকে অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি দিয়েই তাদের বিচার পর্ব শেষ করা হবে।

'শাহেদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পর্যবেক্ষণকারী। আর 'মাশহুদ' হলো সে জিনিস যা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সূরা বুরুজের ৭ম আয়াত ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে ঃ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

অর্থাৎ যারা এ যুলম প্রত্যক্ষ করছিল এবং যাদের ওপর যুলুম হচ্ছিল তাদেরকেও প্রত্যক্ষ করছিল। তারা এ কথার ওপর শপথ করছিল যে, এ সব অত্যাচারী লোকদের অবশেষে ধ্বংস করা হয়েছে।

"رجع" এর অর্থ বৃষ্টি এবং ارض ذات صدع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যমীন ফেটে উদ্ভিদ গজানো।

লাইলাতুল কদরের সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম হওয়ার তাৎপর্য হলো মানব ইতিহাসের সহস্র মাসে কখনো মানব কল্যাণের জন্যে এমন কাজ হয়নি যা এ এক রাত্রিতে হয়েছে।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ 'আয়াতের তাৎপর্য এই যে, নবী করীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে দুনিয়াতে প্রত্যেক পরবর্তী সময় প্রথম সময় থেকে উত্তম হতে থাকবে। যার আখেরাত হবে দুনিয়া থেকেও উত্তম।

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ

এর অর্থ হলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ।

কাউসারের 'অর্থ হলো অনেক মংগল। এ শব্দটি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে প্রদত্ত অগণিত মংগলবোধক।

আমার মতে মাওলানা ফারাহীর সূরায়ে ফী'লের তাফসীর ঠিক নয়। স্বয়ং সূরার বাক্যবিন্যাস এ তাফসীর গ্রহণ করে না। যদি মাওলানা ফারাহীর ধারণা মতো কথা হতো তব সূরার বিন্যাস এভাবে হতো تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ .

প্রাপক—
মুহাম্মদ ফারুক সাহেব,
দফতারুল হাসানাত, রামপুর, ভারত।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১০৪

১৬ মার্চ '৬৫

আমার শ্রদ্ধেয়,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আপনি সিরিয়ার যে দুঃখ জনক অবস্থার কথা লিখেছেন সে সম্পর্কে আমি প্রথমেই আরবী সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিছুটা অবগত হয়েছি। এখন আপনার চিঠির মারফতে আরো বিস্তারিত অবগত হলাম। আরব উপকন্ঠে বসে ঠিক রামাদান মাসে এ সব লোক মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার অবিচার ও খুন-খারাবী করে চলছে পরিতাপের বিষয় যে, আমরা নিজের দেশের সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আওয়াজও তুলতে পারছি না। যা হোক আমার দ্বারা যে তদবীর করা সম্ভব তা করতে ইনশা আল্লাহ্ দ্বিধা করবো না।

প্রাপক—
হাফেয ইহছান ইলাহী জহির সাহেব,
মদীনা মুনাওয়ারা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১০৫

১০ মার্চ '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রেরিত পুস্তিকা পেয়েছি। মুসলমানদের কর্তব্য জাপানের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং সেখানে ইসলামের পয়গাম পৌছে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ওপর এটা জাপানের অধিকার। আল্লার ফজলে কতিপয় মুসলমান যুবক সেখানে কর্মরত আছেন এবং আমিও তাদের কাজকে অন্তর দিয়ে সমর্থন করি। আমার গ্রন্থ "ইসলাম পরিচিতি" জাপানী ভাষায় তরজমা হয়েছে। প্রকৃত মুশকিল হলো উপায় ও উপাদানের স্বল্পতা–যার কারণে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না।

প্রাপক—
মুহাম্মদ রফিক আনোয়ার সাহেব,
গুজরান ওয়ালা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১০৬

১১ ফেব্রুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রেরিত গ্রন্থ "Mohammad the Last Prophet" আমার হস্তগত হয়েছে। এ কষ্টের জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমেরিকা ও অন্যান্য অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বসবাসরত মুসলমানদের নতুন জেনারেশনকে ইসলামের সাথে পরিচয় করার জন্যে আপনি একটি অত্যন্ত ভালো কাজ শুরু করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনার এ প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং এটাকে মুসলমানদের জন্যে কল্যাণের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

আমি আমার ইংরেজী বই-পত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় দামেস্ক থেকে প্রকাশ হয় সেখান থেকে এনে আপনাকে পাঠানো তো দীর্ঘসময়ের ব্যাপার আপনি যদি সরাসরি সেখান থেকে চেয়ে পাঠান তবে সহজ হয়।

প্রাপক—
ওহাবী ইসমাঈল,
আমেরিকা আমেরিকান মুসলিম সোসাইটি,
মিচিগান (USA)

খাকসার,
আবু আ'লা

পত্র — ১০৭

৩ মার্চ '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। ১৯৪০ সালে লিখিত পুস্তিকাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফত্ওয়া। সে সময় অনৈসলামী (ইংরেজ) সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন আদর্শ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল এবং শাসনতন্ত্রেও লিখা হল যে, কুরআন ও সুন্নার খেলাফ কোনো আইন প্রবর্তন হবে না-তখন নীতিগতভাবে এটা ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে গেল। এখন এর বাস্তব ত্রুটি সমূহের জন্যে এখানে কিছুতেই এমনসব আহকাম জারি করা যাবে না যা কুফরী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে বর্তমান সরকারের সরকারী চাকুরী যদি প্রকৃতিগত দিক থেকে শরয়ীভাবে নাফরমানীর সংজ্ঞায় না পড়ে তবে তা শুধুমাত্র সরকারী চাকুরী হওয়ার কারণে গুনাহ নয়।

প্রাপক—
তাউস খান
এবটাবাদ

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১০৮

২৮ ফেব্রুয়ারী '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

হাত জোর করে সালাম করার পদ্ধতি কোনো অকাট্য ও প্রমাণ্য হুকুমের ভিত্তিতে তো ইসলামে নিষিদ্ধ নেই বটে কিন্তু অমুসলমানদের অনুসরণ নিষিদ্ধ আছে। হাত জোড় করে সালাম করা হিন্দুদের রেওয়াজ। মুসলমানদের মধ্যে এটা কখনো প্রচলিত ছিল না। এখন কোনো মুসলমানের এ পদ্ধতি গ্রহণ করা এ কথার আলামত যে, সে হিন্দুদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

মানুষের মানসিক যোগ্যতা সমূহ জানার জন্যে হস্তরেখা (Palnistry) গণনাপদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা এটা কোষ্ঠিগণনা শাস্ত্রের একটি শাখা যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এটাকে ভাগ্য জানার জন্যে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা এরূপ প্রয়োগে শরীয়তে নিষেধ আছে।

কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, ইহুদীরা দুনিয়ার কোনো অংশে কখনো রাজত্ব পাবে না। সেখানে তো বলা হয়েছে যে, তাদের ওপর বে-ইজ্জতী ও লাঞ্ছনা সব সময়ের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের জন্যে এ সিদ্ধান্ত সামষ্টিকভাবে করা হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, মাঝে মধ্যে পৃথিবীর কোনো না কোনো যালেম তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে তাদেরকে ভয়ানক শাস্তি দেবে। এ দু'টি কথার তাৎপর্য এ নয় যে, সহস্র বছরের দীর্ঘ সময়ে এ বিশাল পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতর অংশও এরূপ হবে না যা কোনো সীমিত সময়ের জন্যেও তাদের করতলগত হবে না।

প্রাপক—
এম. হাবীবুল্লাহ্ সাহেব,
লণ্ডন, ই, সি–২

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র– ১০৯

১০ মার্চ '৬৫

মুহতারামা ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

পত্র পেয়েছি, কুরআনে মজীদে আইন প্রণয়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা এই যে, যখন কোনো সমস্যা দেখা দিত তখন আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর নবীকে বলতেন যে সমস্যার সমাধান এরূপ হওয়া উচিত। ব্যভিচারের মিথ্যারোপ করা, লেয়ান স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে অসত্য হলে স্বামী নিজের জন্যে লানত কামনা করে এবং যিহারের[১] বিষয়গুলোতেও এ পদ্ধতিতেই সমাধান করার হুকুম হয়। এর উদাহরণ এভাবে বুঝা যায় যে, আজ যদি এমন কোনো সমস্যা দেখা দেয় যার সম্পর্কে প্রচলিত আইনে মূলতঃ কোনো সমাধান নেই তবে এমতাবস্থায় কোনো অর্ডিনেন্স বা ধারা এ উদ্দেশ্যে জারী করতে হবে যার সূত্র ধরে আদালত সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

প্রাপক–
জিয়াউল্লাহ্‌ খান সাহেব,
রামপুরী, রাওয়াল পিণ্ডি।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১১০

১০ মার্চ '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আপনার আন্তরিক প্রস্তাবের জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি নিজেই অনেক দিন যাবৎ এ চিন্তা করে আসছি যে, জামায়াত আমাকে আমীর বানানোর পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর বানিয়ে নিক। এখনো আমার ইচ্ছা যে, আসন্ন আমীর নির্বাচনের আগে জামায়াতের কাছে এ পরিবর্তনের দরখাস্ত পেশ করব। জামায়াতের আন্দোলনকে গোটা দেশব্যাপী

---

১. স্ত্রীর শরীরের কোনো অংশকে কোনো মুহাররাম নারীর শরীরের কোনো অংশের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলে।

পূর্ণাংগ আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্যে কয়েক দিন আগেই একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। সত্বরই তা আপনাদের কাছে পৌছবে।

প্রাপক–
হাকীম মুহাম্মদ যুবাইর,
কামর সাহেব, খুরীরটাহ্ (আযাদ কাশ্মীর)।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১১১

১৫ মার্চ '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

পত্র পেয়েছি। "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্যে সিজদা করার যদি হুকুম থাকতো তবে স্ত্রীর জন্যে তার স্বামীকে সিজদা করার হুকুম হতো" এ হাদীস দ্বারা স্ত্রীর জন্যে স্বামীর গুরত্ব আরোপ করা উদ্দেশ্য। এর অর্থ এ নয় যে স্বামী মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বরং স্ত্রীর মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল করা উদ্দেশ্য যে, স্বামী ব্যতীত সমাজে তার ইজ্জত ও নিরাপত্তা লাভ হতে পারে না। এ জন্যে আপন স্বামীর সাথে যথাসম্ভব একাত্ম ও সমমনা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তার অবাধ্যতা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা কর্তব্য। এ জিনিসটাকে যদি কেউ যুলম হিসেবে ব্যাখ্যা করে তবে উচিত সে যেন বিধবা ও তালাক প্রাপ্তা মহিলাদেরকে নিজেই জিজ্ঞেস করে যে, সে স্বামী বিহীন জীবন কিভাবে অতিবাহিত করে

প্রাপক—
সাইয়েদ হাতেম আলী সাহেব,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১১২

২৭ মার্চ '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

১৩ মার্চ যথাসময়ে আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু কিছু ব্যস্ততার জন্যে আমি যথাশীঘ্র জবাব দিতে পারিনি। এ বিষয়ে প্রথমেই একটি চিঠির মাধ্যমে ওজর পেশ করেছি। এখন আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি ঃ

একঃ মরহুম আল্লামা ইকবালের সাথে আমার মাত্র দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার যখন তিনি মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে হায়দ্রাবাদে তার বিখ্যাত ছ'টি খুৎবা শুনান। দ্বিতীয়বার ১৯৩৭ সালের শেষে যখন আমি তাঁর কথানুযায়ী পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। তাঁর ইলম, জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও ইসলামের খেদমত সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার মধ্যে যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং এখনো হচ্ছে এ দু'টি সাক্ষাতের বিশেষ প্রতিক্রিয়া তা থেকে কিছুমাত্র ভিন্নতর ছিল না।

দুইঃ জ্বি হ্যাঁ। এটা ঠিক যে, মরহুম আল্লামাই আমাকে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শেই আমি হিজরত করেছি।

তিনঃ কোনো সমাজে কোনো চিন্তাধারার ভবিষ্যৎ দু'টি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। একটি এই যে, সে চিন্তাটি নিজে মন-মগজকে প্রভাবিত করার কতটুকু শক্তি রাখে। দ্বিতীয়ত, এ চিন্তাকে সহায়তা করার জন্যে সমাজে কতটা মানসিক, নৈতিক, শিক্ষাগত শক্তি বিদ্যমান আছে। ইকবালের চিন্তাধারায় প্রথম বস্তুর তো কমতি নেই কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুটি খুবই কম। আর এ কমতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণে তার চিন্তার কোনো ভবিষ্যৎ এখানে নেই এ কথা বলা যেমন কঠিন, তেমনি এটাও বলা সহজ নয় যে, ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

চারঃ এ প্রশ্নটি দীর্ঘ জবাবের দাবীদার। তবে কতিপয় বাক্যে এটা বলা যায় যে, 'খুদী' অর্থ আত্ম পরিচয়। দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের সাফল্য ও সৌভাগ্যের সমগ্র নির্ভরশীলতা 'আত্ম পরিচয়' ও 'আল্লার পরিচয়ের ওপর।' 'আত্ম পরিচয়' ছাড়া আল্লার পরিচয় সম্ভব নয়। অপরদিকে আত্ম বিস্মৃতি ও আল্লাহ বিস্মৃতি সমস্ত ত্রুটির উৎস। মানুষ আত্ম বিস্মৃতির কারণে আল্লাহ বিস্মৃতিতে মগ্ন হয়ে পড়ে।

পাঁচঃ আল্লামার প্রসিদ্ধ ষষ্ঠ খোৎবার ওপর সংক্ষিপ্ত চিঠির মাধ্যমে মন্তব্য করে সেগুলোর হক আদায় করা কঠিন। এ সময়ে বিস্তারিত মন্তব্য লেখার অবকাশ নেই। খোৎবাগুলো এমন এক সময়ে লেখা হয়েছিল যখন ইসলামী চিন্তা-ভাবনা, দর্শন ও জীবন বিধানের ওপর পাশ্চাত্য আক্রমণে ইসলামী বিশ্বে বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করে এবং এর ওপর অস্থিরতার ঘোর অমানিশা নেমে আসে। এ মুহূর্তে ইসলামী আকীদা এবং চিন্তা ও কর্ম-পদ্ধতিকে নূতনভাবে ঢেলে

সাজাবার যে প্রাথমিক চেষ্টা করা হয়েছে তাতে মরহুম আল্লামার খোৎবাগুলোর মর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা বলা ঠিক হবে না যে, এ সংস্কার পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে ঠিক ছিল। এতে সমকালীন অবস্থার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো বিষয়ের বর্ণনায় এটিও দেখা যায়। এ কারণে যদি কেউ এটাকে চূড়ান্ত সংস্কার কাজ বলে তবে তা ভুল হবে। তবে সাহিত্যে এ বিশেষ পদ্ধতি অগ্রবর্তী দল হিসেবে এর মর্যাদা অনস্বীকার্য।

প্রাপক— খাকসার,
শোরেশ কাশ্মীরী সাহেব, আবুল আ'লা
লাহোর।

পত্র — ১১৩

১৯ জুন '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আল্লাহ ভীতি সকল ত্রুটি থেকে মুক্তি দান করে এবং আল্লাহ প্রীতি সমস্ত কল্যাণের উৎস।[১]

প্রাপক— খাকসার,
এম এ রউফ আওয়ান আবুল আ'লা
খানপুর।
জিলা— রহিম ইয়ারখান।

পত্র — ১১৪

১৯ জুন '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমি আমার নিবন্ধে যা কিছু লিখেছি তার মধ্যে আমার লিখিত বাক্যের অতিরিক্ত পড়ার চেষ্টা আপনি করলে তা

---

১. পত্র লিখক মুহতারাম মাওলানা থেকে 'অটোগ্রাফী' চেয়েছিলেন। ১৯ শব্দ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত চিঠি মাওলানা তার জবাবে লিখেন।

আমার ওপর যুলুম করা হবে। আমি কোথায় লিখেছি যে, হযরত উসমান (রাঃ) থেকেই রাজতন্ত্রের সূচনা হয় অথবা হযরত উসমান (রাঃ) বনী উমাইয়াদেরকে রাজত্ব করার জন্যে বড় বড় পদ দান করেন? এ দুটো আপনি কোথায় পেলেন? আমি তো আমার ইংগীতেও একথা লিখিনি। হযরত উসমানের (রাঃ) অসহায়তা সম্পর্কেও আমি কিছু উল্লেখ করিনি। আমি যা কিছু লিখেছি তা শুধু হযরত উসমানের (রাঃ) মারওয়ানকে সেক্রেটারী বানানো এবং বসরা ও কূফা থেকে মিসর পর্যন্ত সমস্ত এলাকায় একই সময়ে একটি বংশের লোকদেরকে গভর্ণরের পদে নিযুক্ত করা যা বিভিন্ন কারণে ফিতনার অনিবার্য উৎসে পরিণত হয়। আমি যা কিছু লিখেছি তা স্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ থেকে লিখেছি, যা ইবনে আবদুল বার্‌র, ইবনে সাদ, ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর ও ইবনে আছীরের মতো সর্বজন স্বীকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আপনি হয় এ কথা বলুন যে , এসব ঘটনার কথা ওসব বুযর্গগণ বলেননি। অথবা বলুন যে, এ সব ঘটনা প্রবাহ প্রকৃতপক্ষে ফিতনার অনিবার্য কারণ ছিল না। যদি আপনি প্রথম কথা বলতে চান তবে প্রথমতঃ সে সব কিতাবগুলো আপনি নিজে পড়ে নিন। সেগুলোর পৃষ্ঠাসহ আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি। সেখানে যদি এ সব ঘটনা পাওয়া না যায় তবে আমাকে অবশ্যই সতর্ক করবেন। আর যদি আপনি দ্বিতীয় কথা বলতে চান তবে আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন যে, হযরত উসমানের (রাঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল কি হয়নি? বিদ্রোহীরা মদীনায় প্রবেশ করেছিল কি করেনি? হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন কি হয়নি? এ সব ঘটনার কোনটাই অস্বীকার না করলে মেহেরবানী করে বলুন যে, এটা কেন হল? এটা কি ফিতনা ছিল নাকি ফিতনা ছিল না ? আর এগুলো যদি ফিতনাই হয়ে থাকে ও তবে কি কারণে এগুলো পৃথিবীতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? কোনো কারণ ছাড়াই পৃথিবীতে ফিতনা হতে পারে কি?

'এ প্রসংগগুলো ঘাটাঘাটি না করা উচিত'। আপনার এ কথাটি আমার ধারণা মতে গভীর চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতি নয়। আপনার জানা থাকা উচিত যে, আজ এ সব ঘটনা বর্ণনা করার প্রথম ব্যক্তি আমি নই। সহস্র বছর থেকে মুসলমানদের ইতিহাসে এ সব ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। লাখ লাখ মুসলমান অমুসলমান এ সব ঘটনা কিতাব-পত্রের

মাধ্যমে পড়ে আসছে। আপনার দেশের স্কুল কলেজের ইসলামের ইতিহাসের প্রত্যেকটি ছাত্র এ সব ঘটনা পড়ে আসছে। এগুলো আপনি কোনো ক্রমেই গোপন রাখতে পারবেন না। এখন যদি যুক্তিসংগত ও যথাযথ পদ্ধতিতে লোকদেরকে এ ইতিহাস বুঝানো না যায় তবে লোকেরা এগুলোর ওপর আজব ধরনের প্রলেপ দিয়ে লিখবে। আর আপনার দেশের শিক্ষিত মহল সেগুলো পাঠ করে পথভ্রষ্ট হবে।

আপনার এ ধরাণাও পুনরায় চিন্তা করে দেখার দাবী রাখে যে, এ ইতিহাস বর্ণনার দ্বারা সোনালী যুগকে আপত্তিকর বলে মনে করা হবে। আপনার ধারণা কি এই যে ইবনে সায়াদ ও ইবনে জরীর থেকে ইবনে কাছীর পর্যন্ত যারাই এ যুগের ইতিহাস লিখেছেন তারা এ কথা বুঝতে সক্ষম হননি যে, এ ইতিহাস দর্শনে সোনালী যুগকে আপত্তিকর বলে মনে করা হবে? এ শংকার অর্থ তো এই যে, মুসলমানদের তাদের নিজেদের ইতিহাস লেখাই উচিত হয়নি বরং ঘটনাবলীকে পর্দাকৃত রাখাই উচিত ছিল।

প্রাপক–
মাওলানা–সায়াদুদ্দীন সাহেব,
মর্দান।

খাকসার,
আবুল আলা

পত্র—১১৫

৬ জুলাই '৬৫

মুহতারীম ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। মেহেরবানী করে সর্ব প্রথম আপনি আমার সে বাক্যগুলো উল্লেখ করুন যেগুলোর মাধ্যমে আমি হযরত উসমানের (রাঃ) সাথে বে–আদবী করেছি। এ গোটা বিষয়টিতে যে ব্যক্তি তাঁকে বরাবর একজন খলীফায়ে রাশেদ হিসেবে পেশ করেছে তাঁর সৌন্দর্য ও কাজের মূল্যায়ন করেছে এবং তাঁর ওপর আরোপিত নিরর্থক অভিযোগ খণ্ডন করেছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি এ কথা কিভাবে বলতে পারেন যে, সে তাঁর সাথে বেআদবী করেছে।

আসল কথা হলো আপনারা বুযর্গদেরকেও মা'সুম মনে করে বসে আছেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, যিনি বুযর্গ তিনি ভুল করেন না। আর যে ভুল করবে সে বুযর্গ নয়। এ কারণে আপনি মনে করেন যে, যখন কেউ কোনো বুযর্গ ব্যক্তির কোনো কাজকে ভুল সাব্যস্ত করে (যদিও তা অত্যন্ত সংযত ও ভদ্রজনোচিত ভাবে উল্লেখ করা হয়) তখন সে অবশ্যই ঐ বুযর্গের বুযর্গীকে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের থেকে ভিন্নতর। আমি বুযর্গদের বুযর্গীকে স্বীকার করি এবং তাঁদেরকে অত্যন্ত সম্মানও করি। কিন্তু তাদের কোনো কাজ ভুল হয়ে গেলে সেটাকে ভুল মনে করি এবং সেটাকে ভুল বলে থাকি। এ আংশিক ভুলের জন্যে আমার মতে তাঁদের সামগ্রিক বুযর্গীতে কোনো তারতম্যের সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া ভুলকে ভুল বলা আমার সখের বিষয় নয় যে অযথা প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ করে বেড়াই। কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তবেই শুধুমাত্র আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হই।

এবার আসল প্রসংগে আসা যাক যে সম্পর্কে আপনি আলোচনা করছেন। আপনি বা অন্য কেউ এ ঘটনা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এককালে একই সময়ে বসরা, কূফা, সিরিয়া এবং মিশরের গভর্ণররা এমন বংশের লোক ছিলেন যাদের সাথে সমকালীন খলীফার বংশীয় সম্পর্ক ছিল। এ কথাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আরমানিয়া, আজারবাইজান, খোরাসান, পারস্য প্রভৃতি এলাকা বসরা ও কূফার গভর্ণরদের আওতাধীন ছিল এবং আফ্রিকার সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য মিশরের গভর্ণরের করতলগত ছিল। এর অর্থ এই যে, আরব উপদ্বীপের বাইরে যতগুলো বিজয়ী রাজ্য ছিল সেগুলো তৎকালীন খলীফার বংশের সাথে সম্পর্কিত গভর্ণরদের অধীনস্থ হয়ে যায় এবং কেন্দ্রেও খলীফার সেক্রেটারী পদে সে বংশেরই একজন লোক অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সব কাজকে ফিতনার অনিবার্য উৎস স্বীকার না করা হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? ইহুদী মুনাফিক ইবনে সাবা ষড়যন্ত্র কি বিনা কারণেই বিদ্রোহ বিশৃংখলা সৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছিল? আপনার জ্ঞান কি এ সাক্ষ্য দেয় যে, ফিতনার কোনো অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও একটি মুনাফিক অগনিত মুসলমানকে (যার মধ্যে সাহাবা ও সাহাবা সন্তানগণও শামিল ছিলেন) নিজের সাথে মিলাতে সক্ষম হয়েছিল?

এখানে ব্যাপারটি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক নয়। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, ফিতনাবাজ লোকেরা এ ছিদ্র দিয়েই ফিতনা সৃষ্টির পথ পেয়ে যায়। হাফেয

ইবনে কাসীর 'আল-বেদায়া ও আল নেহায়া' কিতাবে লিখেছেন যে, কুফা থেকে হযরত উসমানের (রাঃ) কাছে অভিযোগ করার জন্যে যে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় তারা জোর দিয়ে এ বিষয়টি তার সামনে তুলে ধরে। তার ভাষায়ঃ

بعثوا الى عثمان من يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بنى امية من اقربائه واغلظوا له فى القول وطلبوا منه ان يعزل عماله ويستبدل ائمة غيرهم (جلد ۷ صفحہ ۱۶۷)

"হযরত উসমানের (রাঃ) কাছে সে সব অভিযোগ পেশ করার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হল, যা সাহাবীদের বরখাস্ত করে তদাস্থলে নিজের আত্মীয় বনী ওমাইয়ার লোকদেরকে নিয়োগ করার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিনিধি দল হযরত উসমানের (রাঃ) কাছে জোর প্রতিবাদ জানালো এবং নিজের আত্মীয় অফিসারদেরকে বরখাস্ত করে সে স্থানে অন্য অফিসার নিয়োগের জোর দাবী জানালো।

ইমাম যুহরী তবাকাতে ইবনে সায়াদে বর্ণনা করেছেনঃ

ثم توانى (عثمان) فى امرهم (اى امر المسلمين) واستعمل اقرباءه واهل بيته فى ست الاواخر (من خلافته) وكتب لمروان خمس مصر واعطى اقرباءه المال فانكر الناس عليه ذلك (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۶۴)

"তারপর হযরত উসমান (রাঃ) নিজের খিলাফতের শেষ সাত বছর আপন বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকে সম্মানিত করেন এবং মুসলমানদের ব্যাপারে অলসতা করেন। মারওয়ানকে মিশরের এক-পঞ্চমাংশ লিখে দেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে ধন-দৌলত দান করেন। সুতরাং লোকেরা এগুলোর প্রতিবাদ করে।"

ثم ان عبد الله بن سعد . . . حمل خمس افريقية الى المدينة فاشتراه مروان بن حكم بخمسمائة الف دينار . فوضعها عنه عثمان وكان هذا مما اخذ عليه . (التاريخ الكامل جلد ۳ ص ۴۷)

"আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ আফ্রিকার এক পঞ্চমাংশ (গনীমতের মাল) নিয়ে মদীনায় আসলেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম পাঁচ লাখ দিনার দিয়ে তা খরিদ

করে নিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) এ পাঁচ লাখ আদায় করা থেকে তাকে (মারওয়ানাকে) মাফ করে দিলেন। এটাও অভিযোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

وكان الناس ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له و يرون ان كثيرا مما ينسب الى عثمان لم يأمر به وان ذلك عن رأى مروان دون عثمان فكان الناس قد شنفوا لعثمان لما كان يصنع بمروان ويقربه (طبقات ابن سعد جلد ٥ ص٣٦)

"লোকেরা হযরত উসমানকে (রাঃ) দোষারোপ করল যে, তিনি মারওয়ানকে নিকটে টেনে নিয়েছেন এবং তার কথাই মেনে চলেন। লোকেরা দেখলো মারওয়ান নিজেই সরকারী আদেশ জারী করে তাতে হযরত উসমানের (রাঃ) নাম ব্যবহার করে। লোকেরা হযরত উসমানের (রাঃ) এ সব কাজ এবং মারওয়ানকে ঘনিষ্ঠ ও ক্ষমতা দানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ওপর অভিযোগ করে।

ومروان كان اكبر الاسباب فى حصار عثمان - لانه زوّر على لسانه كتابا الى مصر بقتل اولئك الوفد.(البداية والنهاية جلد ٨ ص٢٥٩)

"হযরত উসমানকে (রাঃ) অবরোধ করার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মারওয়ান (আর এ অবরোধই তাঁর নিহত হবার অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়)। কারণ সে হযরত উসমানের (রাঃ) পক্ষ থেকে মিশরের গভর্ণরের কাছে জাল চিঠি পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লিখা ছিল যে, এ প্রতিনিধি দল মিশরে পৌঁছা মাত্র তাদের হত্যা করে ফেলবে।

অতঃপর হযরত যুবাইর ও তালহার (রাঃ) হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদাতের কিছুদিন পর এক বিবৃতিতে যে কথা বলেছিলেন তা প্রনিধানযোগ্য–

انما اردنا ان يستعتب امير المؤمنين عثمان ولم نرد قتله فغلب سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه . (الطبرى جلد ٣ ص٤٨٦)

"আমরা চেয়েছিলাম আমীরুল মুমিনীন নিজের ভুলের তদারকী করুন তাকে হত্যা করার কোনো ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু মূর্খ সন্ত্রাসবাদী লোকগুলো বিজ্ঞ সংযত লোকদের হারিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেললো।"

এসব বাক্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উসমানের (রাঃ) এ পলিসি উল্লেখিত বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাদ্বয়ও অপছন্দ করতেন। কিন্তু এর সীমা এতোটুকু অতিক্রম করে তাঁকে এ কারণে হত্যা করা হবে তা তারা কখনই কামনা করেননি। এমনিভাবে তাবারী ও ইবনে কাছীরের রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আয়েশাও (রাঃ)এ পলিসি অপসন্দ করতেন। (তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৭৭;বেদায়া ,খঃ ৭, পৃঃ ১৬৮–১৬৯)।

এখন রয়ে গেল আপনার এ অভিযোগ যে, 'এ ধরনের আলোচনায় উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী সাধিত হয়।' এ বিষয়ে এটা জরুরী নয় যে, আপনাকে আমার অথবা আমাকে আপনার দৃষ্টিভংগী মেনে নিতে হবে, আমার মতে এরূপ আলোচনায় অপকারের চেয়ে উপকার বেশী হয়ে থাকে। সে যুগের ইসলামের ইতিহাস আজকে সহস্র নয় লাখ লাখ ছাত্র পড়ছে। সে সময়ের ইতিহাসকে যদি সঠিক পদ্ধতিতে তুলে না ধরা হয় তবে এথেকে খুবই খারাপ ফল বের হবে।

প্রাপক—
মাওলানা সায়াদুদ্দীন সাহেব,
মর্দান।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১১৬

১৪ সেপ্টেম্বর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠি পেয়েছি। যে বিষয়ের ওপর আমি এ গ্রন্থটি (খেলাফত ও রাজতন্ত্র) রচনা করছি তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়। এ সময়ে এর উপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এখানকার লোকেরা যদি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, তারা কোনো নিরপেক্ষ গবেষণা বরদাশত করবে না এবং তার ওপর গঠনমূলক সমালোচনা করার পরিবর্তে হট্টগোল করা শুরু করবে তবে এ কারণে তো জ্ঞান চর্চার কাজ বন্ধ করে দেয়া যাবে না। আমি যা কিছু লিখছি তাতে প্রত্যেকটি জিনিসের সূত্র বলে দিয়েছি। আমার এ দাবী নয় যে, আমার

কোনো কথা চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়ের। আমার লেখায় কোনো জিনিস ইলমী মর্যাদার দিক থেকে যদি ভুল হয় তবে সে ভুল বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করতে হবে। আমি তার সংশোধন করে নেব।

প্রাপক— খাকসার,
মাওলানা সায়াদুদ্দীন সাহেব, আবুল আ'লা
মর্দান।

পত্র — ১১৭

৪ঠা আগষ্ট '৬৬

মুহতারাম মাওলানা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

২২ জুলাই আপনার চিঠি হস্তগত হয়। আমার সাথে আপনার যে আন্তরিক সম্পর্ক আলহামদু লিল্লাহ! আপনার সাথেও আমার অনুরূপ আন্তরিক সম্পর্ক বজায় আছে। আমি মনে করি আপনি যা কিছু বলেন তা আল্লার সন্তুষ্টির জন্যেই বলেন। কিন্তু আমার ধারণা যে, কোনো কোনো বুযর্গ আমার সম্পর্কে যেসব কথা বছরের পর বছর ধরে রটিয়ে আসছেন সেগুলোর ওপর আপনি নিজের কর্মব্যস্ততার দরুন চিন্তা গবেষণা করতে পারছেন না। রটানো কথায় প্রভাবিত হয়ে আপনি আমার কল্যাণার্থে কতিপয় পরামর্শদান করেছেন। আমি চাই আপনি সামান্য কষ্ট স্বীকার করে এগুলোর ওপর কিছুটা তাহকীক করুন। অতপর আরো একটু সুস্পষ্টভাবে আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

আপনি লিখেছেন—"তোমার সাহিত্য পাঠকদের মধ্যে সলফে সালেহীন ও বুযর্গানে দ্বীন সম্পর্কে এক ধরনের বে আদবী ও অসম্মান পরিলক্ষিত হয়।" আপনার এ সংক্ষিপ্ত কথায় অসম্মান যে কোন স্থানে করেছি তা কেমন করে বুঝবো? আমার দ্বারা কোন্ বাক্যে কার বে-আদবী হয়েছে? যদি নির্দিষ্টভাবে সে সব জায়গাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতাম তবে তার সংশোধন করতে পারতাম। অনির্দিষ্টভাবে আমি কোন জিনিসের সংশোধন করব? জ্ঞাতসারে যদি আমার দ্বারা কারো বে-ইহতেরামী হতো তবে জানতে পারতাম যে আপনার ইংগিত কোন জিনিসের প্রতি।

আপনি 'সত্যের মাপকাঠি' যুক্ত বাক্য সংশোধন করার কথা বলেছেন। কিন্তু আমার ধারণা যে, আপনি নিজে কখনো সে আসল বাক্যটি দেখেননি। বরং এর চর্চা শুনে আসছেন। মেহেরবানী করে মাওলানা আবদুর রহিম সাব অথবা গোলাম আযম সাবকে বলুন তারা যেন আপনাকে জামায়াতের গঠনতন্ত্রের সে আসল বাক্যটি দেখিয়ে দেয় যার ওপর বছরের পর বছর ব্যাপী শোরগোল চলছে। বাক্যের শব্দাবলী এবং যে প্রাসংগিকতার প্রেক্ষাপটে শব্দগুলোর সংযোজন হয়েছে তা প্রথমতঃ দেখে নিন। তারপর আমাকে বলুন যে, সেখানে আপনি কি ধরনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন।

আপনি এ কথাও বলেছেন, "তুমি একটি অসীয়ত কিংবা সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দাও যে, জামায়াতের লোকেরা যেন শরয়ী কাজে আমার ব্যক্তিগত মতামতের অনুকরণ না করে বরং হাক্কানী আলেমদের গৃহীত রায়ের অনুসরণ করে।" সম্ভবতঃ আপনার জানা নেই যে, যেদিন জামায়াতে ইসলামীর জন্ম হয় সেদিনই আমি এ ঘোষণা করেছিলাম যে, ইলমী ও শরয়ী ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ কেউ করবেন না। এ ঘোষণা এখনো জামায়াতে ইসলামীর প্রচারিত কার্যবিবরণীতে বিদ্যমান আছে। এরপর আমি আবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছি এবং এ কথাও কয়েকবার লিখেছি যে, শরয়ী মাসায়েলের ব্যাপারে যে রায় আমি প্রকাশ করি তার মর্যাদা ফত্ওয়ার নয়। বরং আমার প্রকাশিত মতামত আলেমদের চিন্তা-ভাবনার জন্যে। এ সমস্ত কথা সময় সময় প্রকাশিত হতে থাকে। এখন আপনি আমাকে কোন্ নূতন ঘোষণা করার কথা বলছেন? যদি আমি আরো এরূপ ১০/১২টি ঘোষণা দিয়েও দেই। এবং দিবানিশি এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকি তবুও যেসব বুযর্গ আমার বিরোধিতা করার শপথ গ্রহণ করেছেন তারা নিজেদের সে সৎ কর্ম থেকে বিরত থাকবেন না। আমাদের দ্বীনদার মহলে এমন অনেক নেক নিয়ত ও সরল প্রাণ বুযর্গ আছেন এবং অবশিষ্ট থাকবেন যারা তাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন এবং হবেন। এ কারণে আমি ধৈর্য ধারণ এবং বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তাদের অভিযোগের জবাব দেব না, নিজের কাজ করে যাব।

আপনি এ কথাও বলেছেন যে, জামায়াতের কিছু লোকজন এমন আছে যারা বুযর্গানে দ্বীনের ওপর অভিযোগ করে থাকে, আমি চাই যে, যে লোকটি আপনার জানামতে এমন হয় অথবা ভবিষ্যতে হবে সে লোকটি সম্পর্কে

আমাকে অথবা ঢাকার মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে অবশ্যই জানাবেন যাতে তার সংশোধন করা যায়। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত নোটিশে মনে তো পেরেশানী এসে যায় কিন্তু খারাবী কোথায় তার হদিস পাওয়া যায় না যাতে তার সংশোধন করা যায়।

হযরত উসমান (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি তা গ্রন্থাকারে ছাপানো হচ্ছে। গ্রন্থ প্রেস থেকে আসলে অমনি এক কপি আপনার নামে পাঠিয়ে দেব।[১] সম্পূর্ণ বইটি দেখার পর যেসব জায়গা আপনার দৃষ্টিতে আপত্তিকর সেগুলো দাগ দিয়ে দেবেন। শ্রুত কথার ওপর মতামত প্রতিষ্ঠা করার চাইতে মূল জিনিস দেখে নেয়া উত্তম।

আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমি খুবই উৎকন্ঠিত। আল্লার কাছে মুনাজাত করছি তিনি আপনাকে সেফা দান করুন এবং আপনার দ্বারা দ্বীনের খেদমত সমপন্ন করুন। আফসুস যে, গত সফরে এমন কিছু ব্যস্ততা ছিল যদরুন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনি।

প্রাপক—
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেব,
প্রিন্সিপাল—জামেয়ায়ে কোরআনিয়া,
লালবাগ শাহী মসজিদ, ঢাকা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১১৮

১০ আগষ্ট '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনার প্রশ্নের জবাব এই যে, আমি হযরত মুয়াবীয়াকে রাদিআল্লাহু আনহু এ কারণে লিখি যে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তাঁকে এ কারণে সম্মান করি যে,

১. খেলাফত ও মুলুকিয়াত যা তখন যন্ত্রস্থ ছিল। বর্তমানে বইটি খেলাফত ও রাজতন্ত্র নামে বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। (সংকলক)

তিনি যেখানে অনেক ভুল করেছেন সেখানে আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেদমত সম্পন্ন করেছেন। যেহেতু আমি পূর্ণ ইতিহাস লিখছি না বরং একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কাজ করছি এ কারণে আমি শুধুমাত্র আমার গ্রন্থের বিষয় বস্তুর সীমা পর্যন্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করেছি।

যেসব সম্মানিত আলেম আমার বর্ণনা ও ঘটনাবলীকে ভুল বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, যেসব কিতাবের উদ্ধৃতি আমি দিয়েছি, সে সব কিতাব ভুল নাকি আমার উদ্ধৃতি ভুল? যদি আমার কোনো উদ্ধৃতি ভুল হয় তবে মেহেরবাণী করে তা চিহ্নিত করে দিন। আর যদি এ সব উদ্ধৃতি সঠিক হয় তবে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে যে, ইবনে সায়াদের কিতাব তবকাত, ইবনে আবদুল বারের কিতাব ইসতিয়াব, ইবনে জারীর ইবনে আসীর ও ইবনে আসীরের ইতিহাসগুলো সবই ভুল। তারপর ওসব মাননীয় আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করুন যে, আপনারা কিসের মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাস জেনেছেন? ইলহামের মাধ্যমে কি আপনারা এ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন? নাকি কোনো গোপন ইতিহাসের বই দ্বারা কেবলমাত্র আপনাদের কাছে আছে যার ওপর ভিত্তি করে আপনারা এ সব বলছেন যে, ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালায় যেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো ভুল। আর সঠিক ও নির্ভুল ঘটনা প্রবাহ শুধুমাত্র আপনাদেরই জানা।

প্রাপক—
ইয়ার মুহাম্মদ খান সাহেব,
সিভিল লাইন রোড, ঝিলাম।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১১৯

১২ আগষ্ট '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যিকর শব্দটা অনেক জিনিসের জন্যে প্রযোজ্য নয়। এর একটি অর্থ মনে মনে আল্লার স্মরণ করা। দ্বিতীয় অর্থ কথপোকথন ও

কথাবার্তায় আল্লার নিয়ামত, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর হুকুম-আহকামের স্মরণ করা। তৃতীয় অর্থ কুরআনে মজীদ ও শরীয়তে ইলাহীর শিক্ষা বর্ণনা করা। সেটা শিক্ষাগতভাবে হোক কিংবা পারস্পরিক আলোচনা আকারে হোক। চতুর্থ অর্থ তাসবীহ তাহলীল ও তাকবীর। যেসব হাদীসে আল্লার যিকিরের মজলিশ ও হালকার ওপর হুজুরের সম্মতির কথা উল্লেখ আছে সেগুলো হল প্রথম তিন প্রকারের হালকা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যার ওপর রাজী ছিল না তা হল চতুর্থ প্রকার হালকা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হালকা করে তাসবীহ তাহলীল সশব্দে উচ্চারণ করার প্রথা ছিল না। না নবী (সঃ) এর শিক্ষা দিয়েছেন, না সাহাবাগণ কখনো এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

প্রাপক–
জহুর আহম্মদ সাহেব,
লাহোর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২০

২৩ আগষ্ট '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। মুহাম্মদ হোসাইন হাইকেল ছিলেন প্রথমতঃ মিশরীয় বুদ্ধিজীবীদের ঐ গ্রুপের সাথে জড়িত যারা ছিলো আধুনিকতাবাদী (Modernist)। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেন। কিন্তু পূর্বের প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি। এ জন্যে তাঁর সব কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে, নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়া সফরের সময় ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের কাছে থেকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই এবং এটা কুরআনের খেলাফ।

আবাবিলের ঘটনা সম্পর্কে আমি তাফহীমুল কুরআনের ৩য় খণ্ডের ২৩৯ থেকে ২৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ আলোচনা দ্বারা আপনি

ঘটনার তথ্য সম্পর্কেও জানতে পারবেন এবং এটাও জানতে পারবেন যে, হাদীস সমূহ যাচাই করার সঠিক পদ্ধতি কি।

মোজেযা সম্পর্কে মুহাম্মদ হুসাইন হাইকেলের কথাতো অত্যাচ্চুর্ণ্য যে, কুরআন ছাড়া রাসূলের অন্য কোনো মোজেযার ওপর বিশ্বাস রাখা জরুরী নয়। কিন্তু সাথে সাথে মুহাম্মদ হুসাইন হাইকেল এ সত্যটি ভুলে গেছেন যে, সহীহ যেসব মোজেযা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো অস্বীকার করা ঠিক নয়। খবরে ওয়াহেদ যদিও ঈমান ও আকীদার উৎস হতে পারে না। কিন্তু এদ্বারা ঘটনার জ্ঞান অর্জিত হয়। সঠিক হাদীসের অস্বীকার করা অবশ্যই একটি ভ্রান্ত কাজ।

প্রাপক—
সায়ীদ আনোয়ার মুলতানী,
শায়ালপুর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২১

২৫ সেপ্টেম্বর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। এ সময় ভারতীয় মুসলমানরা এমন নিপীড়িত অবস্থায় আছে যেমন এক সময় আমরা ইংরেজ শাসনামলে ছিলাম। বরং আজ তাদের নিপীড়িত অবস্থা আগের চেয়ে অধিক। তাদের সম্পর্কে অযথা ফতওয়া বাজীর প্রয়োজনীয়তা নেই। আর না এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে যে, তাদের মধ্যে যারা ভারতের সেবা করে চলেছে তাদের পরিণাম কি হবে। তাদের পরিণাম আমাদের হাতে নেই বরং আল্লার হাতে। তিনি সকলের সাথে সরাসরি ন্যায় ও রহমতের ভিত্তিতে আচরণ করবেন। আমাদের তো তাদের জন্যে শুধু এ দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ তাদেরকে পরাধীন অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দান করেন।

প্রাপক—
হাকীম মুহাম্মদ শরীফ সাহেব মুসলিম
শরীফ দাওয়াখানা, হায়দরাবাদ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২২

১৪ সেপ্টেম্বর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি,। আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, যাহের ও বাতেন অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্কিত। কিন্তু এরূপ সম্পর্ক নয় যে, যার যাহের ইসলাম সম্মত তার বাতেনও অবশ্যই ঠিক হবে এবং যার যাহের ইসলামী আহকামের খেলাফ হবে তার বাতেনও অবশ্যই ইসলাম বিমুখ হবে।

আপনি যে, অধপতনের কথা উল্লেখ করেছেন এর অর্থ এ নয় যে, দ্বীনের প্রদীপ নিভে গেছে। দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী লোক আল্লার ফযলে সব সময় আছে এবং তাঁদের ওছীলায় সাধারণ মুসলমাদের মধ্যে দ্বীনের মহব্বত ও দ্বীনি রীতিনীতির মান-মর্যাদা বিরাজমান আছে। এখনো যদি দ্বীনের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী লোক গণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাংগঠনিকভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেন তবে সাধারণভাবে সংশোধন না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

প্রাপক —
আহমদ আশরাফ সাহেব
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২৩

৩১ আগষ্ট '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। কুরআনে 'মুতাশাবাহ' শব্দটির মুহকাম শব্দের বিপরীতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিপরীত ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে এর তাৎপর্য নির্দিষ্ট করতে হবে। উর্দু ও [illegible] কোনো শব্দ আমি প্রাপ্তির-

ইংরেজীতে Similitude(সাদৃশ)-ও এর সঠিক অনুবাদ নয়। কিন্তু পাদটীকায় আমি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি তাতে তার সঠিক তাৎপর্য বুঝতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না।[১]

مالك يوم الدين এবং ملك يوم الدين উভয়ই মুতাওয়াতের কেরাত যা শুরু থেকেই কারীদের কাছে গ্রহণীয়। এ উভয় প্রকার কেরাতের প্রতি কেবলমাত্র মাছহাফে ওছমানীর বর্ণ প্রণালী নয়। বরং উভয় কেরাতের সনদ ইলমে কেরয়াতে বর্তমান আছে। এ কারণেই উভয় কেরাত সঠিক মানা হয়।

পাবেন— খাকসার,
রহম আলী হাশেমী সাহেব আবুল আ'লা
দিল্লী, ভারত।

পত্র – ১২৪

২ অক্টোবর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। উল্লেখিত অভিযোগ সমূহের জবাব নিম্নে প্রদাম করা হলঃ

একঃ أَوْلَىٰ بِهِمَا এর অনুবাদের সংশোধন প্রথমেই করা হয়েছে এবং তর্জুমানে এর ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। বর্তমান অনুবাদ হল– "আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অধিক তাদের জন্যে কল্যাণকারী।"

দুইঃ সূরায়ে আলে–ইমারানের উল্লেখিত স্থানের তাফসীর মুফাসসিরগণ এ পদ্ধতিতেও করেছেন যা পত্রে অবলম্বন করা হয়েছে। আবার এ পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়েছে যা আমি গ্রহণ করেছি। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীরে লিখেছেনঃ

ثم رجع جل ذكره الى الخبر عن قولها وانها قالت اعتذارا الى ربها انما كانت نذرت فى حملها فحررته لخدمة ربها "وليس الذكر كالانثى" لان الذكر اقوى الخدمة واقوم بها وان الانثى لا تصلح فى بعض الاحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة -

১. তাফহীমুল কুরআন, খঃ ২, সূরায়ে আলে ইমরানঃ টীকা –৬

"তারপর আল্লাহ তায়ালা হযরত মরিয়মের (আঃ) কথার বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে, হযরত মরিয়মের (আঃ) মাতা নিজের রবের কাছে স্বীয় মানত "আমার গর্ভস্থ সন্তান আমার রবের খেদমতের জন্যে ওয়াকফ করে দিলাম"– সম্পর্কে ওজর হিসেবে এ কথা বলেছেন "পুরুষ স্ত্রীলোকের মত নয়।" এ কথার তাৎপর্য হলো ছেলে খেদমতের জন্যে অধিকতর উপযোগী ও শক্তিশালী। মেয়েরা কোনো কোনো সময় বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করতে পারে না। উপসনালয়ের সেবা করতে পারে না। (সংকলক)

এরপর ইবনে জারীর, কাতাদাহ, সুদ্দি, ইকরামাহ প্রমুখ কতিপয় মুফাসসিরের উক্তি এ তাফসীরের সপক্ষে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে কাসীরও প্রায় অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেছেন । তিনি বলেন,

ليس الذكر كالأنثى اى فى القوة والجلد فى العبادة وخدمة المسجد الا قصى

"পুরুষ লোক স্ত্রীলোকের মত নয়। অর্থাৎ ইবাদাতে শক্তি রাখতে, পরিশ্রম সহ্য করতে এবং মসজিদে আকসার খেদমত সম্পন্ন করার দিক থেকে।"

বাইযাভীও লিখেছেন ঃ

ويجوزان يكون من قولها بمعنى وليس الذكر كالأنثى بيان فيما نذرت فتكون الام للجنس .

তিনঃ তৃতীয় অভিযোগের জবাব এই যে, আমি শাব্দিক অর্থ করছি না বরং এমনভাবে মূল ভাব ফুটিয়ে তুলছি, যাতে উর্দূ ভাষার সাহিত্য মর্যাদাও অক্ষুন্ন থাকে। যদি আমি এভাবে তর্জমা করতাম যে, "নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে।" তবে উর্দূ সাহিত্যের দৃষ্টিতে বাক্যটি অসুন্দর হয়ে পড়তো। হত্যার মামলায় কিসাসের হুকুম লেখার তাৎপর্য প্রত্যেক উর্দূ জানা লোক এমনই বুঝবে যা নিহতদের ব্যাপারে কিসাসের হুকুম লেখা যাওয়ার তাৎপর্য হতে পারে।

এপ্রসংগে[১] الحر بالحر و العبد بالعبد এর তর্জমার ওপর অভিযোগটি বিস্ময়কর। অভিযোগকারী এ হুকুমের তাৎপর্য কি এভাবে ব্যক্ত

---

১. স্বাধীন লোক হত্যাকারী হলে তবে সে স্বাধীন লোকটি থেকে বদলা নিতে হবে। দাস হত্যাকারী হলে দাসকেই হত্যা করা হবে---(বাকারাহঃ ১৭৮)

করতে চান যে, আযাদের পরিবর্তে আযাদ, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বিনিময়ে স্ত্রীলোককে হত্যা করতে হবে?

হত্যাকারীর জীবন নেয়াই নিহত ব্যক্তির কিসাস, যদি স্বাধীন লোকের হত্যাকারী গোলাম হয় তবে তাকে ছেড়ে কোনো স্বাধীন লোককে হত্যা করা যাবে না। আয়াতের অর্থ এভাবে যদি করা না হয় যা তাফহীমুল কুরআনে করা হয়েছে। তবে আসল বক্তব্য পরিষ্কার হবে না।

প্রাপক—
মুহাম্মদ হোসাইন বাযারী সাহেব
নাছিরাবাদ, জিলা–লারকানা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১২৫

২ অক্টোবর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আবুল আ'লা কোনো উপাধি নয় যা আমি নিজে গ্রহণ করেছি। বরং এটা আমার নাম যা আমার পিতা আমার জন্মের পর রেখেছেন। আমার বংশের সর্বপ্রথম বুযর্গ যিনি সেকান্দর লোদীর শাসনামলে ভারতবর্ষে এসছিলেন তাঁরও এ নামই ছিল। আমার মরহুম পিতা তাঁর নামানুসারে আমার নাম রাখেন। কারো নাম কোন বংশে বা কোন জিনিসের সাথে সম্পর্কিত ধরনের প্রশ্ন করা বিস্ময়কর ব্যাপার।

পরিশেষে আপনি কোন্ কোন্ বংশ সম্পর্কে অভহিত হতে পারবেন? সম্ভবতঃ লোকদের এখন অন্য কোনো কাজ করার যোগ্যতা নেই। তাই অযথা এ ধরনের নিরর্থক আলোচনায় নিজের সময়ের অপচয় করে ফেলছেন।

প্রাপক—
আকেল জাফরী সাহেব
নওশহরাহ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২৬

২১ অক্টোবর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

১৪ অক্টোবর আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্ত কয়েকদিন জামায়াতের মজলিশে আলোচনার বৈঠকের জন্যে এতোটা ব্যস্ত ছিলাম যে, যথাশীঘ্র জবাব দিতে পারিনি। এ দেরী হবার জন্যে ওজর পেশ করছি।

আমি এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা এবং জিহাদে কাশ্মীরের জন্যে যা কিছু করেছি তা আল্লাহ এবং তাঁর দীন কর্তৃক আমাদের ওপর আরোপিত ফরযের মুকাবিলায় অনেক কম। আল্লার কাছে আরাধনা করছি তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আরো বেশী বেশী খেদমত করার শক্তি দান করুন।

আপনি মুহতারাম মাওলানা খুররম আলী সাবের কবিতা প্রকাশ করে একটি কল্যাণকর খেদমত সম্পন্ন করলেন। এ কবিতা বিশেষ করে নিজেদের ঐতিহাসিক পটভূমিকার সাথে খুবই কল্যাণকর প্রতীয়মান হবে। ইনশা আল্লাহ আমি চেষ্টা করবো যাতে কবিতাগুচ্ছ ভালো কাগজে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে ছাপা হয়ে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। জামায়াতের প্রচার ও প্রকাশনী দফতরকে আমি এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। যদি সম্ভবপর হয় তবে এর আরো কতিপয় কপি পাঠিয়ে দিন যাতে জামায়াতের বিভিন্ন শাখায় পাঠানো যায়।

প্রাপক— খাকসার,
মুহাম্মদ ইয়াকুব হাশেমী সাহেব, আবুল আ'লা
সেক্রেটারী, আযাদ কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েট, মুজাফফরাবাদ।

পত্র — ১২৭

৩১ অক্টোবর '৬৫

মুহতারারমী ও মকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার প্রেরিত তোহফা পেয়েছি।[১] এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে মুবারকবাদ দেয়ার ব্যাপারে আমি আপনার

১. '৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধে বিমান বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল খেদমতে

সাথে শরীক আছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিমান বাহিনীর সাহায্যকারী ও হেফাজতকারী। ভবিষ্যতে তিনি তাদের আরো বিজয় দান করুন।

প্রাপক—
হারুণ ব্রাদার্স
মিরিট রোড, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২৮

১৫ নভেম্বর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি না এ কথা লিখেছেন যে, সে ইংরেজী তাফসীরটি কোন্‌টি যার মধ্যে ইবনে জারিবের তাবারীর তাফসীরের এ বাক্য নকল করা হয়েছে। আর না এ কথা বলেছেন যে, সে তাফসীরে ইবনে জারীর কোন স্থানের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। ইবনে জারীরের তাফসীরে এমন কোনো বাক্য আমার দৃষ্টিতে পড়েনি যার ইংরেজী তর্জমা এরূপ হতে পারে যা আপনি উল্লেখ করেছেন। আপনি সূত্র উল্লেখ করলে আসল কিতাব দেখে বুঝতে পারতাম যে, এ বাক্য কোথায় কোন পূর্বাপর পরম্পরায় এসেছে। হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় সমস্ত আয়াতগুলো আমি ইবনে জারীরের তাফসীরে অবলোকন করেছি। ইবনে জরীর নিজেও প্রত্যেক জায়াগায় হজরত ঈসার (আঃ) পিতাহীন জন্ম হওয়ার সমর্থক বলে পরিদৃষ্ট হয়। এ সম্পর্কীত আয়াতসমূহের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি যেসব রেওয়াতের উল্লেখ করেছেন সেগুলোও এ ব্যাখ্যারই সহযোগী। যে বাক্যের আপনি উল্লেখ করেছেন যদি তা সঠিকও হয় তবে এর অনিবার্য উদ্দেশ্য এটাই নয় যে, হজরত মরিয়ম (আঃ) কোনো পুরুষের সঙ্গ লাভের কারণে গর্ভধারণ করেন। বরং এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, যেভাবে সমস্ত সন্তান মায়ের উদরে অবস্থান করে থাকে সেভাবে হযরত ঈসার (আঃ) অবস্থানও মায়ের উদরেই হয়েছিল।

খুশী হয়ে হারুণ ব্রাদার্স (করাচী) রুমাল বিতরণ করে। এ সব রুমালে বিমান বাহিনীর মনোগ্রাম অংকিত ছিল। এর জবাবে মুহতারাম মাওলানা রশীদ হিসেবে এ পত্র লিখেন। (সংকলক)

এ কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিন যে, কোনো একটি হাদীস দ্বারা এমন কোনো উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যথার্থ প্রামাণ্য পদ্ধতি হতে পারে না যা ঐ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমগ্র হাদীস এবং স্বয়ং কুরআনের বর্ণনার খেলাফ হয়। হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবারা এবং তাবেয়ীদের থেকে যতো রেওয়ায়েতই হাদীস ও তাফসীরে উল্লেখ হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণই আক্ষরিক অর্থের দিক থেকে তাঁর বাপবিহীন জন্ম হওয়ার কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। কোনো একটি রেওয়ায়েতেও এ কথার উল্লেখ নেই যে, তাঁর কোনো পিতা ছিল। তারপর সবচেয়ে বড় কথা হলো কুরআন নিজেই তাঁর জন্মকে একটি মোজেযা বলে ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক স্থানে তাঁকে ইবনে মরিয়ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সন্তানকে পিতার পরিবর্তে মায়ের দিকে সম্বোধন করা আরবেই নয় বরং সারা বিশ্বের প্রচলিত বিধির বিপরীত। কুরআনের সমগ্র বর্ণনা একত্রিত করলে দেখা যাবে এর অনিবার্য ফল এই যে, তিনি বাপছাড়া জন্ম গ্রহণ করেছেন। আমি এর দলীলসমূহ তাফহীমুল কুরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। (খঃ১ পৃঃ ২৫০-২৫২, ২৫৯, ৪১৭; খঃ ৩, পৃঃ ৫৯, ৬৩-৬৭, ১৮৪, ২৮১ দ্রষ্টব্য)

এ সমস্ত জিনিসের মুকাবিলায় যদি কেউ ইবনে জারীরের শুধুমাত্র এমন একটি রেওয়ায়েতের সাহায্য নেয় যা নিজেই দুটি অর্থবহ। তবে সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কুরআন-হাদীসের নয় বরং নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করে চলেছে।

প্রাপক—
হাকীম মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব,
গুজরাট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১২৯

১৭ নভেম্বর '৬৫

মুহতারামী ও মুকাররামী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অনেকদিন পর আপনার চিঠি পেয়ে খুশীও হয়েছি এবং আপনার দুঃখজনক অবস্থা অবগত হয়ে দুঃখিত হয়েছি। নিজের স্ত্রী বিয়োগের ফলে

আপনি যে অস্থিরতার শিকার হয়েছেন আর যে মানসিক কেলশসহ বর্তমানে কালযাপন করছেন তাতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করার পরামর্শ দেয়ারই নামান্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমতাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া মানুষের আর কিছুই নেই। ধৈর্য ধারণ না করলেও যে ক্ষতি হয়ে গেল তা আর পূরণ হবে না। শুধু নিজের দুঃখই বাড়বে। স্থানান্তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে দুঃখের লাঘব তো হবে না বরং আরো বৃদ্ধি পাবে।

আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে, আপনার স্ত্রী বিয়োগ আপনার সন্তানদের জন্যে একটি শাস্তি। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু শাস্তি নয়। বরং এ বিশ্ব চরাচরের পরীক্ষাগারে মানুষ অনিবার্যভাবে যেসব অগণিত পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তন্মধ্যে এটা একটি। পৃথিবীর কেউ অবিনশ্বর নয়। মৃত্যু সকলকেই বরণ করতে হবে। মৃত্যু অবশ্যই এ শর্তসহ আসে না যে, মৃত ব্যক্তির পরবর্তী সময়ে এমন লোক যেন না থাকে যে তার মৃত্যুর কারণে সদা পেরেশান থাকবে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই মরতে হবে। অধিকাংশ মৃতব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যাতে অন্যান্য অনেক লোকের জন্যে শোকাভিভূত হওয়া ছাড়াও অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার অন্যান্য অনেক পরীক্ষার মত মানুষকে এ পরীক্ষারও কখনো অবশ্যই সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায় অধৈর্য না হওয়ার পরিবর্তে আল্লার কাছে দোয়া করতে হবে যে, এ মুসীবতে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি দান করুন এবং এদ্বারা যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা যেন দূর করে দেন।

দোয়া সম্পর্কেও বুঝতে হবে যে, দোয়া একটি দরখাস্ত বিশেষ যা বিশ্ব মালিকের কাছে পেশ করা হয়। মালিক প্রত্যেক দরখাস্ত মনজুর করতে বাধ্য নন। কোনো দোয়া এ শর্তের সাথে পেশ না করা উচিত যে, এ দোয়া অবশ্যই কবুল করতে হবে। আমাদের কাজ হলো তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। তিনি মালিক আমরা তাঁর বান্দা হওয়ার এটাই যুক্তিসংগত দাবী। তিনি কবুল করেন তো সেটা তাঁর কাজ। আর কবুল না করেন তো সেটা তাঁর ইচ্ছা। যদি সাধারণ মানবীয় সরকার প্রত্যেক দরখাস্তকারীর দরখাস্ত কবুল না করেন তবে তাদের দরখাস্ত কবুল না হওয়ার কারণ এমন অনেক কল্যাণ নিহীত থাকতে পারে যা দরখাস্তকারীগণ জানে না। তা হলে পরিশেষে এ বিশ্বের আইন-শৃংখলা কিভাবে চলতে পারে যদি আল্লাহ মুনাজাতকারীর প্রতিটি দোয়া হুবহু কবুল করে নেন।

বয়স সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের বয়স নিজেই নির্ধারণ করবে এবং নির্দিষ্ট বয়স সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ মারা যাবে না। যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মানুষ এমনটি করতে সক্ষম হয়নি। আজকের সমস্ত মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রত্যেক বয়সের মানুষ মারা যাচ্ছে। হাসপাতালের অভ্যন্তরে লোক মরছে এবং এমন সচ্ছল লোকও মারা যাচ্ছে যাদের সম্ভাব্য বড় বড় সুযোগ গ্রহণ করার অবকাশ আছে। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বড় জোর এ দাবী করা যায় যে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে এবং বয়েসী লোকদের মৃত্যুর হার বেড়েছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, মানুষের হাতে বয়সের চাবিকাঠি এসে গেছে। প্রকৃতপক্ষে যেভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্ট জগতের বিধানসমূহের রহস্য আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের কাছে আস্তে আস্তে খুলছেন এবং ধীরে ধীরে সেগুলো অধিক উপকরণের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করার শক্তি দান করছেন, সেভাবে মানুষের রোগ জীবানুর রহস্যও আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের কাছে উদঘাটন করছেন। রোগের চিকিৎসার উপকরণও তাঁকে দিয়ে যাচ্ছেন এবং সে মোতাবেক তিনি মানুষের ভাগ্যেরও পরিবর্তন করছেন। কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও মানুষের ভাগ্য আল্লার হাতেই ন্যস্ত। আজও যখন কারো মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠে দুনিয়ার কোনো শক্তিই মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রেহাই দিতে পারে না।

আমার ধারণা মতে আপনার বর্তমান মানসিক অস্থিরতার সব চেয়ে কার্যকরী প্রতিষেধক হলো কুরআনের গভীর অধ্যয়ন। যদি আমার তাফসীর তাফহীমুল কুরআন আপনার কাছে থেকে থাকে তবে আপনি অবসর সময়ের অধিক অংশটা একটা অধ্যয়ন করে কাটাবেন। আশা করি মনে শান্তি অর্জনে এটা আপনাকে অনেক সাহায্য করবে।

প্রাপক— খাকসার,
আলতাফ হোসাইন সাহেব, আবুল আ'লা
চীপ পার্সেল অফিসার, পি, ডব্লিউ, আর, লাহোর।

পত্র — ১৩০ ২০ নবেম্বর '৬৫

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। বীমার সঠিক পন্থাতো সেটাই ছিলো যা আপনি স্বয়ং আরববাসীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে ইহুদী পুঁজিপতিদের প্রভাবে তা বর্তমান রূপলাভ করে, যা নাকি শরয়ী দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার দোষ–ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। আমার মতে রাষ্ট্র কর্তৃক যতোক্ষণ না এ পুরা ব্যবস্থাটাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কেবল আংশিক মেরামত ও পরিবর্তন দ্বারা এটাকে শরীয়তসিদ্ধ করা যেতে পারে না। সরকারী সিকিউরিটিতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তাতো সুদী কারবারেই লাগানো হয়েছে। তার সুদ যদি গরীবদের মধ্যেও বিতরণ করে দেয়া হয়, তা সত্ত্বেও সুদী কারবারে অংশ গ্রহণের গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না।

বীমাকারদের শরীয়ত সম্মত বন্টনের জন্যে আপনি বাধ্য করতে পারেন না। বড় জোর তাকে শুধু এতোটুকু স্বাধীনতা দেয়া যায় যে, যদি ইচ্ছা করে তবে শরয়ী বন্টনের অছিয়ত করতে পারে।

জুয়া খেলায় প্রাপ্ত সম্পদ বাদ দেয়ার যে আকার আপনি লিখেছেন,তাতেও প্রকৃতপক্ষে এর পরিপূর্ণ বর্জন হয় না।

প্রাপক– খাকসার,
জাফরুল্লাহ্ খান রানা আবুল আ'লা
শাহীওয়াল।

পত্র — ১৩১ ১০ আগস্ট '৬৬

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার পত্র পেয়েছি। ইসলামী দর্শন (Philosophy) সম্পর্কে আমি যতোদূর জানি তার ভিত্তিতে বলছি, ইংরাজী ভাষার এখন পর্যন্ত এমন

কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি যেটাকে আমরা সঠিক অর্থে ইসলামী দর্শনের প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থ বলতে পারি। পাকিস্তানে History of Muslim Philosophy নামে একটা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে আপনি কেবল মুসলমানদের বিভিন্ন দর্শন স্কুল এবং তাদের মতবাদ সম্পর্কেই জানতে পারেন। কিন্তু এটা ইসলামী দর্শনের গ্রন্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দর্শন তো হচ্ছে তাই যা কুরআন থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে। দর্শনের যতোগুলো মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে তার সবগুলোর জবাব দিয়েছে। কুরআন এর অনুসন্ধান পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছে। যাতে করে মানুষ প্রকৃত সত্যে (Ultimate Reality) উপনীত হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন অধ্যয়ন করলেই আপনার জন্যে সবচাইতে ভালো হবে।

প্রাপক—
Mr. Mohammad Rila A. H.
Govt. Teacher's College
Addalaichenai, CEYLON.

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৩২

১৮ আগস্ট '৬৬

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার পত্র এসে পৌঁছেছে। আকাশ ও সৌরমণ্ডল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রত্যহ পরিবর্তন হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, দিন দিনই মানুষ নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করছে। এসব জিনিস সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় এ রকম কোনো অকাট্য কথা বলে দেয়া হয়নি যাকে এককালের লোকেরা নিজেদের আকীদাহ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে আর অপর যামানার লোকদের তাতে রদবদলের প্রয়োজন দেখা দেবে। রাশিয়া ও আমেরিকার রকেট যতোদূরই গমন করুক না কেন, তাতে কুরআন–সুন্নাহর বর্ণনার ওপর তাদের কোনো আঘাত পড়বে না।

আপনি যে আয়াতটির[১] কথা উল্লেখ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, জীব-জগত কেবল আমাদের এ পৃথিবীতেই নয়, বরঞ্চ অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেও রয়েছে।

প্রাপক— খাকসার,
মালিক মুহাম্মদ আকবর আকবরীদি আবুল আ'লা
কৌহাট।

পত্র — ১৩৩

১৮ আগস্ট '৬৬

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। এমন কোনো শরয়ী দলিল প্রমাণের কথা আমার জানা নেই যার ভিত্তিতে তামাক চাষ এবং তার ভিত্তিতে পাওয়া উপার্জনকে হারাম বলা যায়। খুব বেশী বললে তামাক (বিড়ি-সিগারেট) পানকে মকরূহ বলা যেতে পারে। আর সেটাও কেবল এ কারণে বলা যেতে পারে যে, এটা দুর্গন্ধ ছড়ায় কিংবা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

প্রাপক— খাকসার,
মিয়া হামিদুল হক সাহেব (মরিদান) আবুল আ'লা

১. আশ-শূরাঃ ২৯। আয়াতটির তরজমা হচ্ছেঃ তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে। এ যমীন ও আকাশ মণ্ডলের সৃষ্টি এবং এ উভয়স্থানে ছড়িয়ে থাকা জীব-জগত। আর তিনি যখন চাইবেন এদের সকলকে তিনি একত্র করতে পারেন।

পত্র — ১৩৪

১৮ আগষ্ট '৬৬

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আমার বক্তব্য এ নয় যে, পবিত্র, গোসল, অযু প্রভৃতি বিষয় পাঠ্য-সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না হোক। প্রকৃতপক্ষে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এগুলো দ্বীনের মৌলিক বিষয় নয়, বরঞ্চ মৌলিক বিষয় হচ্ছে ইসলামের আকায়েদ। এ আকীদাহ বিশ্বাসই প্রথমে ছাত্রদের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং এগুলোর মাধ্যমেই ছাত্রদের মধ্যে ফরযের অনুভূতি এবং নির্দেশ পালনের জযবা পয়দা করে দিতে হবে। অতপর ইসলামের নির্ধারিত সংজ্ঞার আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের পদ্ধতি তাদের শিক্ষা দিতে হবে। যার মধ্যে এখনো আনুগত্য ও ইবাদাতের অনুভূতিই পয়দা হয়নি তাকে তাহারাত ও গোসলের মাসায়ালা শিক্ষা দেয়াটাতো একটা নিষ্ফল কাজও বটে। এতে করে এ আশঙ্কা থাকে যে, যখন এ সব মাসায়েলের মাধ্যমে ছাত্রদের দ্বীনি শিক্ষার সূচনা করা হবে, তখন তাদের মন-মগজে এর এ প্রভাবই সৃষ্টি হবে যে, দ্বীন হচ্ছে— এ সব মাসায়েলেরই নাম।

প্রাপক—
আবদুল হক সাহেব,
জামে মসজিদ, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৩৫

১৮ আগষ্ট '৬৬

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। আরবী ভাষায় আল এবং আহ্‌ল দুটি শব্দ। আহ্‌ল কোনো ব্যক্তি পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে বলে, তারা তার মত ও পথের অনুসারী হোক কিংবা না হোক। [illegible]

কোনো ব্যক্তির অনুসারীদেরকে। আত্মীয় অনুসারী এবং অনাত্মীয় অনুসারী সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাপক–
জনাব আনজুম সাহেব,
আনজুম এণ্ড কোম্পানী, খেমচাঁদ রোড, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৩৬

১৯ আগষ্ট '৬৬

শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনের সূচনাতেই এ কথা লিখে দেয়া হয়েছে যে, এটা শাব্দিক অনুবাদ নয়, বরঞ্চ এতে ভাবার্থ প্রকাশ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফের اٰوٰى اِلَيْـــــهِ এর শাব্দিক তরজমা করার পরিবর্তে সেই ভাবার্থ প্রকাশ করা হয়েছে যা পূর্বাপর ভাষ্য থেকে জানা যায়। এ কথা পরিষ্কার যে, পরবর্তী আলোচনা ভাইদের উপস্থিতিতে হতে পারতো না। সেই ভাইদের সাথে এ ভাইকে অপেক্ষা করতে পর্যন্ত দেয়া হয়নি। اٰوٰى اِلَيْـــهِ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ভাইদের থেকে তাকে আলাদা করে নিজের কাছে স্থান দিয়েছেন এবং এ কথাগুলো তিনি সে ভাইয়ের একান্তে বলেছেন।

মেহেরবাণী করে যদি তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা পড়ে নেন, তবে আমার তরজমা পড়তে গিয়ে আপনার মনে আর কোনো খটকা অনুভব হবেনা।

প্রাপক–
জনাব সালাহুদ্দীন সাহেব।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৩৭

৩০ আগষ্ট '৬৬

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার পত্র পেয়েছি। রাসূলে পাকের সীরাত লেখার আপনি যেভাবে প্রয়োজন অনুভব করছেন, এরূপ প্রয়োজন আমি তখনি অনুভব করছিলাম যখন তাফহীমুল কুরআন লিখতে আরম্ভ করি। কিন্তু তখন তাফহীমুল কুরআন লেখার প্রয়োজন এর চেয়ে বেশী অনুভব করছিলাম এবং আমি চেয়েছিলাম এ কাজ সমাপ্ত করে ইনশাল্লাহ পরবর্তী কাজ করবো সীরাতে-পাক সংকলণের। এটা আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে এযাবত প্রথম কাজটাই সমাপ্ত করতে পারলাম না। কর্মশক্তি এমন দ্রুত বিদায় নিচ্ছে যে এখন এর সমাপ্তিই বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীরাত পাকের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারা তো আরো সুদূর পরাহত বলে মনে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমি সাধ্যানুযায়ী তাফহীমুল কুরআনে সূরা সমূহের ভূমিকা ও টীকায় এ ঘাটতি পূর্ণ করে দেয়ার চেষ্টা করছি, যাতে করে ভবিষ্যতের লেখকগণ এ ধরনের সীরাত লেখার জন্যে যাবতীয় Hints পেয়ে যাবেন।

প্রাপক—
আসআদ গীলানী সাহেব,
বারগোদা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৩৮

২৫ ডিসেম্বর '৬৬

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার ১৭ নভেম্বর ১৯৬৬ তারিখের পত্রটি এখানে এমন এক সময় এসে পৌঁছেছে যখন আমি সউদী আরব চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে চিঠি আমার হাতে আসে। কিন্তু অধিক ব্যস্ততায় জবাব দেয়ার অবকাশ দেয়নি। এখন আপনাকে সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

আপনি নাইজেরিবার অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা পড়ে মনে বড়ই দুঃখ হয়েছে। যদিও আগে থেকে সেখানকার কোনো স্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে ছিল না কিন্তু সে দেশটি এতোটা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার কল্পনাও আমাদের ছিল না যা আপনি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে আমাদের জানালেন। আল্লাহ পাক এ অসহায় উম্মতের প্রতি রহম করুন।

আপনি যেসব পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো খুবই উপযুক্ত। আমি এরূপ ইংরেজী গ্রন্থসমূহের তলিকা তৈরি করছি যেগুলো সেখানকার স্কুল ও কলেজসমূহের লাইব্রেরীতে রাখার যথোপযুক্ত। তালিকাটি প্রণয়ন করা শেষ হলেই ইনশাল্লাহ আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। যে পরিমাণ গ্রন্থ আমরা এখান থেকে পাঠাতে পারি তা সরাসরি এখান থেকে পাঠিয়ে দেবো। বাকীগুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা আপনাদেরকে সেখান থেকে করতে হবে।

ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এর কাজেরও সূচনা হয়েছে জেনে আমি আরো অধিক আনন্দিত হয়েছি। ইলোরিন (ILORIN) সেন্টারের জন্যে গ্রন্থাবলী ক্রয়ের ব্যাপরে যারা তিনশ' টাকা করে প্রদান করেছেন, আমার মতে তাদের জন্যে আর ভিন্নভাবে গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। আমি তালিকা প্রণয়ন করছি, এর আলোকেই আপনারা গ্রন্থ বাছাই করে নিন।

এমনি করে যে সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্যে শিক্ষকের প্রয়োজনের কথা আপনি লিখেছেন, তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তালাশ করার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। ইনশাল্লাহ, এক মাসের মধ্যেই শিক্ষকদের নাম এবং তাদের ঠিকানা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।

খৃষ্টান মিশনারী ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে সে সবের উপযুক্ত জবাব লেখার জন্যে আমি কয়েকজন সাথীকে দায়িত্ব প্রদান করেছি। ইনশা আল্লাহ আগামী দেড় কি দু'মাসের মধ্যে এ কাজটিও সম্পন্ন হয়ে যাবে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে নাইজেরিয়ার কোনো একস্থানে আপনারা বড় আকারের একটা 'বুক ডিপো' প্রতিষ্ঠা করুন, যেখানে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ আমদানী করা হবে এবং সেখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে তা সরবরাহ করতে হবে। সেখান থেকে ভাগে ভাগে অল্প অল্প বই চেয়ে নেয়া মুশকিল হবে।

আর একটি প্রচেষ্টা আমাদের চালাতে হবে। তাহচ্ছে এই যে, সেখানে যদি স্বল্প সংখ্যক মুসলমানও বই ক্রয় করে থাকেন, তবে তাদের ইসলামী বই ক্রয় করার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে।

আপনারা প্রভাবশালী নাইজেরিয়ান মুসলমানদের সংগেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। এ সব কাজে তাদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করুন। তাছাড়া বর্তমানে সেখানে যেসব পাকিস্তানী অবস্থান করছেন, তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি থাকা দরকার। তাদের যারা ইসলাম প্রিয় এবং দ্বীনি জযবা রাখেন তাদের খুঁজে বের করে তাদের নিয়ে কোনো একস্থানে একটি কনফারেন্স করলে ভবিষ্যতে কাজের আরো বহু পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাপক–
আবদুল হক তামান্না সাহেব,
G.S.S. ILORIN, উত্তর নাইজেরিয়া।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৩৯

৪ জানুয়ারী '৬৭

ভাই মাহের সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। শূরা থেকে শূরায়ী ও শূরবী উভয়ই উর্দূ ভাষায় সঠিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা উভয় প্রকারেই লিখেন। প্রথমতঃ আমাদের এখানে শিক্ষণীয় গ্রন্থরাজিতে অধিকাংশ সময়ে শূরাই লেখা হতো। পরে আরবী ও ফার্সী গ্রন্থাবলীর প্রভাবে 'শূরবী' লেখা হতে থাকে। ফার্সী ওয়ালারা 'শূরাই' লিখে থাকেন। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইত্তেহাদে শূরবী লেখা হয়ে থাকে। আরবীতে শূরায়ী লেখা মূলত ভুল।

তোহাম্মতকে তোহম্মদ লেখা একটা ভণ্ডামি আর তহবন্দকে এর উৎপত্তিস্থল মনে করা আরো নিরর্থক। কারণ তহবন্দ শব্দটি নিজেই কোন সঠিক মূল শব্দ নয়। আমি দিল্লীর সাধারণ অসাধারণ সকলকেই তোহম্মত বলতে শুনেছি। কখনো কোনো শব্দের যে উচ্চারণ করা হয় লিখার সময় তার বানান পাল্টানো আমি নীতিগতভাবে ভুল মনে করি। তবে যেগুলো বদলানোর যুক্তিসংগত কারণ থাকে সেগুলোর কথা ভিন্ন। আপনি যে, কবির উদ্বৃতি দিয়েছেন তিনি আমার চেয়ে বেশী উর্দূ জানেন না। করাচীর দিল্লীর হাজার হাজার লোক বাস করে। তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা তোহম্মত বলেন নাকি তোহম্মদ? সম্ভবতঃ এটা আপনার ভুল ধারণা যে, আমি শৈশবকালে কখনো দিল্লীর ভাষা শুনে রেখেছি। অথচ আমার পিতামহ, মাতামহ ও শ্বশুর সকলেই দিল্লীবাসী। আমার কোনো গ্রাম্য শহরতলীয় আত্মীয় পর্যন্ত নেই। আমার প্রয়ত পিতামাতা প্রায় উভয়ই দিল্লীর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা বলতেন। আর আমি নিজে আমার যৌবনের অন্ততঃ দশ বছর তো দিল্লীতে কাটিয়েছি। অর্থাৎ ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত। আপনি আমার কাছে অভিধানের উদ্বৃতি কি পেশ করেছেন। অভিধান সংকলকগণ ভাষাভাষীদের ব্যবহৃত উপমাসমূহ একত্রিত করে অভিধানগ্রন্থে সন্নিবেশিত করে। এবার আপনি আমার উদ্বৃতি দিয়ে নিজের অভিধানে নোট করে নিন যে, এ শব্দটির বানান অন্তে 'তা' (ت)তোহম্মত।

আপনি যদি কোনো শব্দের ব্যবহার এ কারণে পরিত্যাগ করার বিধান বানিয়ে নেন যে, এতে একটি নিকৃষ্ট শব্দের সাথে মিলে একাকার হয়ে যেতে পারে, তবে সম্ভবতঃ চৌধুরীর মত শব্দাবলী ভাষা থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দিতে হবে।

উমর বিন সায়াদের নাম সকল ঐতিহাসিক উমরই লিখেছেন। আমর কেউ লেখেননি। আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে হযরত সায়াদ বিন আবু ওকাজের আমর নামে কোনো সন্তান ছিল না।

প্রাপক—
মাহের আল কাদেরী
সম্পাদক–ফারান, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৪০

২১ জানুয়ারী '৬৭

ভাই মাহের সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ।

আপনার ২৮ রমাদানের (১৩৮৭ হিঃ) চিঠি কাল ৭ শাওয়াল হস্তগত হয়। জানিনা এতোদিন চিঠিটা কোথায় গায়েব ছিল। শুকরিয়া যে, আপনি তোহম্মতের সনদ পেয়ে গেছেন।

'আপিল' যদি 'মোরাফায়া' অর্থে হয় তবে শব্দটি স্ত্রী লিংগ হবে। অন্যান্য অর্থে শব্দটি স্ত্রী লিংগ হিসেবে বলা ও লিখা হয়। যেমন বলা হয় অমুক ব্যক্তি হাইকোর্টে আপিল করেছে। আর আমরা চাঁদার দরখাস্ত করেছি। তাসত্ত্বেও 'মোরাফায়া' অর্থেও আপিলকে স্ত্রী লিংগ বলা ভুল নয়। ইংরেজী শব্দের লিংগ (Gender) এমনিতেই সংশয়যুক্ত।

ফেডারেশন স্ত্রী লিংগ কর্পোরেশন পুং লিংগ। আমার মনে পড়ে না যে, আমি কখনো কর্পোরেশনকে স্ত্রী লিংগ হিসেবে লিখেছি। সজ্ঞানে তো আমি কখনো এরূপ করতে পারি না। 'যিনা' শব্দটি সম্পর্কে আপনার আশ্বস্তির জন্যে এখন আমি এটাই করতে পারি যে, এ শব্দটির প্রয়োগে বাক্য এভাবে বিন্যস্ত করুন যাতে স্ত্রী পুরুষ কোনটাই বুঝায় না। যে কাজ স্ত্রী পুরুষ মিলে করে তার পরিণতি এরূপই হওয়া উচিত।

প্রাপক—
মাহের আল কাদেরী সাহেব
সম্পাদক–ফারান, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৪১

২৬ জানুয়ারী '৬৭

ভাই মাহের সাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যারা আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হিংসা–বিদ্বেষ প্রকাশ করেন তাদের প্রসংগটি আমি আল্লার

ওপর সোপর্দ করে দিয়েছি। তাদের সকল লেখা আমি পড়ি এবং আল্লার আদালতে এগুলো সোপর্দ করে নিজের কাজে লেগে যাই। আমার শেষ পরিণতি দুরস্ত করার জন্যে যে কাজের প্রয়োজন তা এতো অধিক যে অন্যের কোনো কাজে এক মুহূর্ত ব্যয় করাকে আমি সময়ের অপচয় মনে করি। ওসব হযরত নিজের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা নিজেদের পরিণতির জন্যে আমার বিরুদ্ধে বলা ও লেখাকে উপকারী মনে করেন। উভয় অবস্থাকেই নিজের সময় ও পরিশ্রমের ব্যয় খাত হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাদের আছে। আমি ইনশাল্লাহ কখনো তাদেরকে বাধা দেব না। অন্ততঃ আমার এ কামনাও নেই যে, আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউ তাদেরকে বাধা দিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্যিই দিয়েছেন তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর যে মর্যাদা আল্লাহ তায়ালাই আমাকে দেননি তা কেউ আমাকে দিতে পারবেন না। অবশ্য যদি তাদের মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জন দেখে কারো আবেগে আঘাত লেগেই যায় তবে আল্লার উদ্দেশ্যে সত্যের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার জন্যেও আমি বলব না; বিশেষতঃ যখন সে আল্লার তরফ থেকে প্রতিদান পাওয়ার অভিপ্রায়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করবে।

ভাই সাহেব ভাষার ব্যাপারে আপনার জানা থাকা দরকার যে, আমি এর বিশুদ্ধতার ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এ ব্যাপারে আমি দিল্লীর ভাষাকেই অনুসরণ করে থাকি। আমি 'মুরাফায়া' অর্থে 'আপীল' শব্দটিকে পুং লিংগ হিসেবে বলতে অনেকবার দিল্লীবাসীদের কাছে শুনেছি। এমনিভাবে 'ফেডারেশন'কে স্ত্রী লিংগ হিসেবে পড়তে ও লিখতে শুনেছি। 'না হি' ব্যবহারকে আমি সাহিত্যিক অপরাধ মনে করি। কিন্তু এর প্রতিকার কিভাবে করব? আমাদের নিজস্ব মহলের লোকেরাই বর্তমানে এ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। এমনকি তারা আমার কোনো কোনো লিখিত বাক্য অথবা কথা-বার্তার উল্লেখ করতে গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে 'না' এর পরই "হি" যোগ করে দেয়। আমার কোনো লেখায় যদি আপনি এ শব্দের প্রয়োগ দেখেন তবে অবশ্যই উদ্ধৃতিসহ আমাকে অবহিত করবেন।

গতকাল ঘটনাক্রমে খাজা শফী সাহেব আমার এখানে তশরীফ আনেন। আমি তাঁকে যিনা শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেনঃ আমি দিল্লীতে 'যিনা' শব্দটি পুং লিংগ হিসেবে ব্যবহার করতে কখনো শুনিনি। বরং তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন যে, দিল্লীবাসীর কেউ কেউ আজকাল এটাকে পুংলিংগ হিসেবে ব্যবহার করছে। আমারও এ অবস্থা যে, আমি কখনো কোনো দিল্লীবাসীকে 'যিনা কিয়া' বলতে শুনিনি। আমিও আশ্চর্য হলাম যে দিল্লীর কোনো কোনো ব্যক্তি শব্দটিকে পুং লিংগ বলছে। আপনি এখন ওয়াহেদী সাহেব ও অন্যান্য দিল্লীবাসীকে জিজ্ঞেস করে নিবেন যে, খাজা শফী সাহেবের ভাষাও দিল্লীর কিনা।

প্রতি—
মাহের আল কাদরী সাহেব,
সম্পাদক,-ফারান, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৪২

২৬ মার্চ '৬৭

ভাই মাহের সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার মুবারকবাদের[১] জন্যে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এ আন্তরিকতা ও মহব্বতের প্রতিদান দিন।

ইলমে আকায়েদে ভাগ্যকে দু'ভাবে স্বীকার করা হয়। একটি মুবাম (অকাট্য) অন্যটি মুয়াল্লাক (ঝুলন্ত)। মুয়াল্লাক ভাগ্যের সংজ্ঞা এই যে, তা দোয়া ও তাওবার দ্বারা বদলিয়ে যায়। এর দলীল কুরআন ও হাদীস উভয়েই আছে।

খেলাফত ও রাজতন্ত্রের ওপর সমালোচনা কাল রাতেই আমি পড়েছি। যদিও ফারানের গত সংখ্যাগুলো ঘরে পৌছতেই মালিক

---

১. ঈদের চাঁদ দেখা প্রসংগে মুহতারাম মাওলানার আড়াই মাস নজর বন্দী থাকার পর যখন মুক্তি লাভ করেন, তখন মাহের সাহেব মাওলানাকে এ চিঠি লিখেন।

গোলাম আলী সাহেব আমাকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এতোই ভীড় ছিল যে , ২/৩ দিন পর্যন্ত কিছু পড়ার অবকাশ মিলেনি।

প্রাপক–
মাহের কাদেরী সাহেব,
ফারান, করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৪৩

২৬ মার্চ '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আপনার আন্তরিকতা ও মহব্বতের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছি তিনি আপনাকে তার অফুরন্ত প্রতিফল দান করুন। কেননা আপনার সাথে আমার এ আন্তরিকতা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের খাতিরেই।

আল্লার কাছে শুকরিয়া যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য। শুধুমাত্র একদিন বান্নুতে হঠাৎ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হই। তাতে ৪/৫ দিন দুর্বলতা থাকে এবং হজম শক্তিতেও বিঘ্ন ঘটে। আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট নেই।

.... সংগে সাধারণ সভায় শরীক হওয়ার আপনার আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করতাম। কিন্তু কিছু দিনের জন্যে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রে অবস্থান করে অত্যন্ত জরুরী কাজ করতে হবে। নযরবন্দী থাকাকালে কিতাবপত্র পড়া লেখা হতে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ কারণে আমার ইলমী কাজের অনেক ক্ষতি হয়। এখন সে ক্ষতি পূরণের জন্যে আমার নির্জনতার প্রয়োজন। পরিতাপের বিষয় যে, এমন অপমূর্খদের সম্মুখীন হতে হয়েছে যারা বুঝতে পারছে না যে, নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা আমার সময় নষ্ট

করে ভবিষ্যত বংশধরদের কত বড় ক্ষতি করল। তারা নিজেরা এ আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন যে তারা একটি বিরাট কাজ সম্পন্ন করল।

প্রাপক–
শাকীল আহমদ খান
লায়ালপুর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৪৪

২৬ মার্চ '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। এটা জেনে খুশী হয়েছি যে, মিয়ানওয়ালী ইসলামী ছাত্র সংঘ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব ইসলামের ঐক্য অবশ্য জরুরী" এ বিষয়ে একটি নিখিল পাকিস্তান আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এটা একটি অনস্বীকার্য তথ্য যে, বিশ্ব ইসলামের ঐক্য বিশ্বের সমগ্র জাতির জন্যে শান্তির একটি সর্বোত্তম নমুনা ও আদর্শ প্রমাণিত হতে পারে। তবে এর জন্যে অনিবার্য শর্ত এই যে, সর্বপ্রথম মুসলিম দেশসমূহ নিজেদেরকে অমুসলিম আদর্শ ও সংস্কৃতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে। মুসলিম দেশের শাসকগণ সীমিত স্বার্থ কিংবা জাতীয় কল্যাণ সমূহকে সামনে রাখার পরিবর্তে আন্তরিকতার সাথে ইসলামের বিশ্বজনীন ন্যায় নীতির আলোকে মতভেদ ও মত পার্থক্যের অবসান ঘটাতে এবং পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

এ শতাব্দীতে সমগ্র মানবজাতি দুর্বার বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকার শিকার হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরাশক্তি তথাকথিত সভ্য জাতিরা এটোম মারণাস্ত্রের স্তূপ একত্রিত করার প্রতিযোগিতায় দিবানিশি অহরহ মত্ত রয়েছে। এর সাথেই বর্তমান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জোরে-শোরে এ ধারণা পেশ করছে যে, মানবতা ততোক্ষণ পর্যন্ত শান্তির পারাবাত

দেখবে না যতোক্ষণ না স্বৈরচারী দেশগুলো নিজেদের স্বৈরতন্ত্রকে একটি সীমা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারবে।

কিন্তু ইসলামের নীতিসমূহ পরিত্যাগ করে বিশ্বের সামনে ধর্মীয় কিংবা অধর্মীয় এমন কোনো দর্শন নেই যা বিশ্ব রাষ্ট্র (World state) প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে। খৃষ্টাবাদ ও বৌদ্ধবাদ সংসারত্যাগ ও দুনিয়া বর্জনের শিক্ষা দেয়। রাজনীতি ও সামাজিক জীবনের জন্যে কোনো দিক নির্দেশনা তাদের নেই। হিন্দুমত, পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র তিনটিই মানব সমাজের আইন শৃংখলাকে রক্ষা করার পরিবর্তে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। এবং মানুষকে মানুষের দুশমনে পরিণত করে। এরা বিশ্বের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কি শিক্ষা দিবে? কেবলমাত্র ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা সমূহই বিশ্ব মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি প্রমাণিত হতে পারে। এখন প্রয়োজন মুসলমানরা যারা এ আমানতের জিম্মাদার তারা নিজেরা প্রথমতঃ নিজেদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের রজ্জুতে গ্রথিত করবে। অতঃপর নিজেদের কথা ও কাজের প্রচারণার দ্বারা সারা বিশ্বকে এ রজ্জুতে প্রবিষ্ট হওয়ার আহবান জানাবে।

প্রাপক–
শামীম আহম্মদ হাশেমী সাহেব,
নাযেম–ইসলামী ছাত্র সংঘ, মিয়ানওয়ালা।

খাকসার
আবুল আ'লা

পত্র – ১৪৫

১০ মে '৬৭

মাহের ভাই সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

মে মাসের 'ফারানে' তাফহীমুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডের ওপর আপনার সমালোচনা পড়লাম। আপনি সম্পূর্ণ কিতাব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর বাস্তবিকই পর্যালোচনার অধিকার আদায় করেছেন। এ জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

একঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝

আয়াতটিকে যদি পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র কথা হিসেবে ধরা হয় তবে এর তর্জমা অবশ্যই এটা হওয়া উচিত যে, ''তোমাদের জন্যে আল্লার রাসূলের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে''। কিন্তু বাক্য সমূহের যে পরম্পরায় এ অংশটি এসেছে আয়াতটিকে তার মধ্যে রেখে চিন্তা করলে كَانَ শব্দটির অর্থ ''রয়েছে''র পরিবর্তে ''ছিল'' করলেই অধিকতর সঠিক মনে হয়। সূরায়ে আহযাবের দ্বিতীয় রুকূ'তে খন্দকের যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমত ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের নীতিকে সমালোচনা করা হয়েছে। তারপর তৃতীয় রুকূ'তে মুসলমানদের বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম পন্থা তোমাদের জন্যে অনুকরণযোগ্য একটি নমুনা ছিল। এরপর বলা হয়েছে যারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করেছেন তাদের কর্মপদ্ধতিও এরূপ অনুসরণযোগ্য।

দুইঃ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ (الشورى ٢)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে কথা আমি বলেছি তা এ নয় যে, কোনো আংশিক মাসআলায়ও যে ব্যক্তি কোনো অনৈসলামী দর্শন কিংবা সংস্কৃতি অথবা আইনের কোনো অংশ গ্রহণ করে সে ব্যক্তি শিরকে পতিত হয়ে যায়। বরং আমি যা কিছু বলেছি তা এই যে, যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা, আকীদা-বিশ্বাস, আদর্শ এবং দর্শন অন্যান্যদের থেকে গ্রহণ করে তাদের দেয়া বল্গাহীন স্বাধীনতাকে স্বীকার করে তাদের নৈতিক নীতিসমূহ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠিকে গ্রহণ করে এবং নিজের জীবনের বিভিন্ন শাখায় তাদের আইনকানুন ও চাল-চলনের অনুসরণ করে সে প্রকৃতপক্ষে কেননা এটা একটি পরিপূর্ণ দ্বীন যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শরীয়তের খেলাফ এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে আবিষ্কারকগণ আবিষ্কার করছেন এবং স্বীকারকারীগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা এমন শিরক যা গাইরুল্লাহকে সিজদা করা এবং গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করার মত শিরক।

তিনঃ আপনি আমার এ বাক্যের ওপর অভিযোগ করেছেন যে, ''ভাগ্য ও তাকদীর এমন কোনো জিনিস নয় যা আমাদের মত (খোদা নাখাস্তা) স্বয়ং আল্লাকেও নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে এবং দোয়া কবুল করার ইচ্ছা তাঁর থেকে

রহিত করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে বান্দা আল্লার সিদ্ধান্তকে রহিত করার কিংবা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা নিজে এ ক্ষমতা রাখেন যে, বান্দার দোয়া ও মুনাজাত শুনে নিজের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে দেবেন। এ বিষয়ে আপনার মধ্যে এ কারণে সংশয় দেখা দিয়েছে যে, আপনি 'কাযার' জন্যে ফায়সালা শব্দটির প্রয়োগ সঠিক মনে করেন না। আপনার মতে ভাগ্য মুলতবী করা এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, 'কাযার' অর্থ ফায়সালাই। কাযা মুলতবী করা এবং ফায়সালা পরিবর্তন করার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "দোয়া ছাড়া কাযার পরিবর্তন হয় না" হাদীসের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই যে, দোয়া না করা অবস্থায় যে 'কাযা' (ভাগ্য) কার্যকরী হওয়ার তা দোয়া দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে অথবা কার্যকরী হতে বাঁধা পায়। এটাকে যদি এভাবে বর্ণনা করা হয় তবে দোষ কি যে, দোয়া না করা অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার যে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় তা দোয়া করার ফলে আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই আপন মেহেরবানীতে পরিবর্তন করে দেন। এ কথাই সূরায়ে নূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى •

অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ) নিজের সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা আল্লার ইবাদত কর এবং তাক্ওয়ার নীতি গ্রহণ কর আর আমার আনুগত্য কবুল কর। যদি তোমরা এরূপ কর তবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন।" এ আয়াত يُؤَخِّرَكُمْ শব্দটি সুস্পষ্টভাবে এ ইংগীত দিচ্ছে যে, কুফর ও শিরকীর ওপর দৃঢ় থাকা অবস্থায় সিদ্ধান্ত এ ছিল যে, ঐ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা বন্দেগী তাক্ওয়া এবং রাসূলের আনুগত্য করে তবে ঐ ফায়সালা এ সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবর্তিত হবে, যাতে তারা আমল করার অধিক অবকাশ পায়।

এবার কতিপয় শব্দ সম্পর্কেও আরজ করতে চাই। এটা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, আপনি "نہی" এবং "نہیں" দুটি শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য মনে করেন না এবং উভয়কেই সমান সমান ভুল মনে করেন। অথচ উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজী শব্দ "NOR" এর অনুবাদ আজকাল অনেকেই نہی করে থাকেন এবং এটা অবশ্যি উর্দূ ভাষার

রীতি নয়। পক্ষান্তরে এ কথাটি বুঝানোর জন্যে উর্দূ ভাষায় চারটি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

একঃ না তোমার ও কথা ঠিক না এ কথা

দুইঃ না তোমার ও উক্তি ঠিক আর না এটা

তিনঃ না ও কাজটি সঠিক আর না এটা যে, তুমি অমুক কাজ কর

চারঃ তোমরা না জাতির কোনো সেবা করছ না নিজেদের কোনো মংগল করছো।

উল্লেখিত ৪টি রীতিই সঠিক উর্দূ বর্ণনা রীতি ও এগুলোর কোনোটির ওপরই অভিযোগ উথাপিত হতে পারে না।

কালচার শব্দটি আজকাল সংবাদ পত্রের ভাষায় পুং লিংগ হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। পাঞ্জাবের সংবাদ পত্রেও এটাকে পুং লিংগ হিসেবে লেখা হচ্ছে। কিন্তু আমার মতে এটাকে পুং লিংগ বলা ঠিক নয়। ইংরেজী শব্দের পুং লিংগ ও স্ত্রী লিংগ হওয়ার ফায়সালা ভাষাবিদগণ দু'টি বুনিয়াদের ওপর করে থাকেন। একটি হল এর সমার্থ উর্দূ শব্দ স্ত্রী লিংগ নাকি পুং লিংগ। দ্বিতীয় হল শব্দটির শ্রুতি (Sound) উর্দূ উচ্চারণের দিক থেকে পুং লিংগের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি স্ত্রী লিংগের সাথে। কালচার শব্দটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমার্থবোধক এবং শব্দটির শ্রুতিও পুং লিংগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্যে কালচার শব্দটি এগ্রিকালচারের মত স্ত্রী লিংগ। কারণ এগ্রিকালচার কৃষিকার্যের সমার্থবোধক এবং এর শ্রুতিও উর্দূ উচ্চারণে স্ত্রী লিংগ ভাবাপন্ন।

মযহাবী মারাসিম (ধর্মীয় রসম ও রেওয়াজ) এর ব্যাপারেও আপনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এ শব্দটি আমি ইবাদাতের রীতিনীতি অর্থে প্রয়োগ করেছি। আর ইবাদাতের রীতিনীতি এরূপ কেউ লিখে না। ''মযহাবা রসম'' এবং ''মযহাবী মারাসিম'' এ দু'য়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যার প্রতি সম্ভবতঃ আপনার দৃষ্টি পড়েনি। মযহাবী মারাসিম সেসব ইবাদাতকে বলা হয় যেগুলো কোনো ধর্মে প্রচলিত হয়ে গেছে। মযহাবী রসম সে সব রীতি-নীতিকে বলা হয় যেগুলোকে কোনো সমাজে ধর্মীয় রূপ দেয়া হয়েছে।

পর্যালোচনার সময় আপনি আমার যেসব বাক্যের বিবরণ দিয়েছেন সেগুলোরও কোনো কোনো স্থানে আমার ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। জানিনা আপনি নির্ভুলকে ভুল মনে করে সংশোধন করছেন নাকি এটা লেখার ভুল।

যেমনঃ তাগাজ্জিয়া (খাদ্য)-এর পরিবর্তন হয়ে তালাজুজ (স্বাদ গ্রহণ) হয়েছে। যদিও আমি নিজেকে ভাষাতত্ত্বের সনদ (সার্টিফিকেট) হবার দাবী করি না, কিন্তু আমার উর্দূ ভাষা পড়াশুনার কাল প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হতে চলছে। ভাষার বিশুদ্ধিতার ব্যাপারে আমি সব সময় সতর্ক। আমার ভাষায় এমন প্রয়োগও পাওয়া যাবে যেগুলো নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু অশুদ্ধতা আমার লেখায় আপনি কদাচিতই পেয়ে থাকবেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে ভাষার মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার বিপরীত জিনিসও আপনি আমার লেখায় দেখতে পাবেন। কারণ শব্দাবলীর যেসব ব্যবহার বিধি পরিত্যক্ত হয়েছে সেগুলো আমি পরিত্যাগ করেছি এবং নূতন প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করে আসছি। কিন্তু বিশেষভাবে ভারত বিভাগের ফলে বিগত বিশ বছরে উর্দূভাষা ও সাহিত্যের ওপর যে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে, তাতে আমার আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো ভাষাকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচানোর এবং তার সঠিক মানদণ্ডপ্রতিষ্ঠিতরাখার।

প্রাপক-
মাহের আল কাদেরী সাহেব
সম্পাদক-ফারান করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৪৬

১৪ জুন '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার পত্র পেয়েছি এবং জেনে খুশী হয়েছি যে, আপনি এ সময় পবিত্র স্থান সমূহ যিয়ারত করে দ্বীনের অনেক খেদমত সম্পন্ন করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যে মসজিদে আকসাতে বসে আপনি আপনার প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে দাজ্জালের উম্মতের করতলগত হয়ে গেছে। যে সময় আমি আপনার চিঠি পড়ছিলাম সে সময় কাফেরদের এ দখলের খবর পেলাম। এ প্রতিক্রিয়ার কারণেই কয়েকদিন যাবত আপনাকে জবাব দিতে পারিনি। আল্লাহ্ ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার কাছে ফরিয়াদ করা যায়।

আপনার চিঠির মাধ্যমে এ খবর জেনেও খুশী হয়েছি যে, এখন আপনি করাচীতে দরস এ খোতবা দেয়ার জন্যে একটি আলাদা মসজিদ পেয়ে গেছেন, যেখানে বসে শান্তির সাথে অন্যান্য অনেক কল্যাণমুখী কাজও করতে পারবেন।

প্রাপক— খাকসার,
মাওলানা আবুল খায়ের মুসলিম আলূভী সাহেব, আবুল আ'লা
করাচী।

পত্র – ১৪৭

২ মার্চ '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

চিঠিপেয়েছি।[১] আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব নিম্নে দেয়া হলঃ

চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব নহর মহকুমার অবসরপ্রাপ্ত এস. ডি. ও. দারুল ইসলামের জন্যে ৬০ একর জমি ওয়াকফ করেন।

চৌধুরী সাহেব কর্তৃক নির্মিত বাড়ীতে আমি অবস্থান করি। ঐ জমির আয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমার নিজের অথবা তর্জুমানুল কুরআন কিংবা জামায়াতে ইসলামীর কোনো কাজে ঐ আয়ের এক পয়সাও খরচ হয়নি।

১৯৩৮ সনের ১৮ই মার্চ আমি সেখানে পৌছি '৩৮ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানে থাকার পর লাহোর স্থানান্তরিত হই। তারপরে '৪২ সনের জুন মাসে পুনরায় সেখানে স্থানান্তরিত হই। '৪৭ সনের অগাষ্টের শেষ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করি।

---

১. দারুল ইসলাম ও মরহুম আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে ডঃ হাফীজ মালেক মুহতারাম মাওলানাকে কতিপয় প্রশ্ন করেন। এ চিঠি সে প্রশ্নেরই জবাব। (সংকলক)

আমার ও মরহুম আল্লামা ইকবালের মধ্যে কেবল এ বিষয়ে ঐকমত্য ছিল যে, ইসলামী আইনের নূতন সংকলণ ও সম্পাদনা হওয়া উচিত। কিন্তু আমার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং গবেষণা অনুসন্ধান পদ্ধতি ছিলো একান্তই আমার নিজস্ব। আমার ও তাঁর মধ্যে যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়,তা ছিল এই যে, কতিপয় তড়িৎকর্মী যুবককে ইসলামী বিধানের ওপর গবেষণা মূলক শিক্ষা দেয়া হবে এবং পরে নব সংকলণের কাজ শুরু করা হবে। পরে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যে সময়ে আমি হায়দারাবাদ থেকে পাঠান কোটে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম সে সময় আল্লামার রোগ বৃদ্ধি পায়। '৩৮ সনের মার্চে আমি পাঠান কোটে পৌছে জরুরী বন্দোবস্ত করার পর তাঁর আমন্ত্রণে লাহোর গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এমন সময় তিনি ওফাত লাভ করেন।[১]

প্রাপক–
ডাঃ হাফীয মালেক সাহেব,
আমেরিকা।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৪৮

৩ মে '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

চিঠি পেয়েছি। আপনার চিঠির জবাব যথাসময়ে দিতে পারিনি বলে খুবই লজ্জিত। আমার কারাবরণ সময়ে আপনার একখানা চিঠি পেয়েছি। মুক্তি

---

১. ডাঃ সাবের একটি প্রশ্ন এই ছিল যে, মরহুম আল্লামা ইকবাল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আলেমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিনা এবং সেখান থেকে কেউ এসেছিলেন কিনা আর আমন্ত্রিত আলেমই কে ছিলেন? এর জবাবে মাওলানা লিখেন মরহুম ইকবাল জামেয়া আযহারের কাউকে আমন্ত্রণ করেছিলেন কি না এবং আযহার থেকে কোনো আলেম এসেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। (সংকলক)

পাওয়ার পর আরো এক খানা পাই। কিন্তু ১৬ই মার্চ (১৯৬৭) মুক্তি পাওয়ার পর ঘরে পৌছুতেই ব্যস্ততা এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে চিঠিপত্রের জবাব লিখার অবকাশই মিলে না। এতদসত্ত্বেও আমি খলীল সাহেবকে (মুহতারাম মাওলানার আরবী বিভাগের সেক্রেটারী সংকলক) বলে দিয়েছি, আমার পক্ষ থেকে আপনাকে বিস্তারিত জবাব লিখে দেয়ার জন্যে এবং জানিয়ে দিতে যে, সময় পেলেই আমি নিজেই লিখবো।

এ মুহূর্তে আমার সামনে যেসব কর্মব্যস্ততা রয়েছে এগুলো দেখে আশা করা যায় না যে, আমি মধ্য সেপ্টেম্বরের আগে বাহিরের কোনো সফর করতে পারবো। মধ্য সেপ্টেম্বরে আমি ইনশাআল্লাহ্ রাবেতার সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্যে সৌদি আরব যাব।[১] তারপর সেখান থেকে লিবিয়া ও তুরস্ক সফর শুরু করব। যদিও আমার শারীরিক শক্তি এখন অনবরত সফর এবং বিরামহীন পরিশ্রম করা বরদাশত করে না, তবুও লিবিয়া ও তুরস্কের বন্ধু–বান্ধবগণ যে আন্তরিকতা ও মহব্বতের আবেগ নিয়ে আমন্ত্রণ করেছেন তাতে, যে ভাবেই হোক এ বছরই এ উভয় দেশে সফর করা উচিত বলে মনে করি। আর এ কাজের জন্যে অক্টোবর মাসই যুৎসই হতে পারে।

আপনি আপনার উভয় চিঠিতে যেসব বিষয়ের ওপর লিখেছেন আমি সেগুলো সবই নোট করে নিয়েছি। ইন্‌শাল্লাহ্ যখনই আসবো আপনার ফরমায়েশ করা সব জিনিসই সাথে করে নিয়ে আসবো। তথ্যাবলী যতোটা সম্ভব বেশী বেশী করে তৈরি করে নেব।

মেয়ের জন্ম উপলক্ষে আমার মুবারকবাদ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হায়াত, ইলম, সদগুণাবলী ও সুপ্রসন্নতায় ভরপুর করে দিক্।

প্রাপক– খাকসার,
হাবীব রাইহান নদভী সাহেব, আবুল আ'লা
আল–বায়দা, লিবিয়া।

---

১. রাবেতার সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্যে সরকার মুহতারাম মাওলানাকে দেশের বাহিরে যেতে অনুমতি দেয়নি। এর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে রিট

পত্র – ১৪৯

১২ আগষ্ট '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌।

আপনার চিঠি পেয়েছি। সূরায়ে বাকারার ৪৮ ও ৫৩ টীকা এবং সূরায়ে তোয়াহার ১০৬ টীকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপরিত্য নেই। বরং সমস্ত জটিলতা এ কারণে সামনে আসে যে, আদমকে (আঃ) প্রথমতঃ যে বেহেশতে রাখা হয়েছিল এবং আখেরাতে নেককার মানুষকে যে বেহেশ্‌তে রাখা হবে সে সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আশংকা অনুভূত হয় যে, সেটা এ জমিনেই ছিল এবং কথা স্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে বলতে দ্বিধা হয়। কিন্তু এ কথা স্বীকার করার পর ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রথমতঃ হযরত আদমকে (আঃ) ঐ বেহেশতে পরিপূর্ণ খলীফারূপে (Full fledged) রাখা হয় এবং তখন তাঁর জন্যে তাঁর মর্যাদার খেলাফতের যথোপযোগী ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আল্লার পরিকল্পনা ছিল যে, পরীক্ষা ব্যতীত তাকে তাঁর মর্যাদার অধিষ্ঠিত না করা। অতপর পরীক্ষা করা হলে সে সব দুর্বলতার প্রকাশ পেলো যেগুলো সূরায়ে বাকারাহ্‌ ও তোয়াহায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ওসব ব্যবস্থাপনা উঠিয়ে নেয়া হলো। পৃথিবীর পরীক্ষামূলক (Probationary) খেলাফতের বোঝা অর্পিত হলো যাতে খেলাফতের এখতিয়ার পরীক্ষামূলকভাবে দেয়া হলো। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে আখেরাতে স্বতন্ত্র খেলাফত দেয়া হবে। এ সময় এ জমীনকেই তাদের জন্যে পুনরায় বেহেশত বানিয়ে দেয়া হবে।

প্রাপক–
চৌধূরী মুহাম্মদ আকবর সাহেব,
শিয়ালকোট।

খাকসার,
আবুল আ'লা

আবেদন করা হয় '৬৭ সনের অক্টোবরে। ৬৮ সনের অক্টোবর মাসে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এর রায় প্রদান করে। রায় যদিও মাওলানার পক্ষে ছিল এবং সরকারের এ নিয়ন্ত্রণকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় কিন্তু অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে মাওলানা এ সফর করতে পারেননি। (সংকলক)

পত্র — ১৫০

২৮ আগষ্ট '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

তাফ্‌হীমুল কুরআনের কোনো স্থানেই নাযিলের সময়কালের আলোচনায় নাযিলের ধারাবাহিকতার আলোচনা করা হয়নি। বরঞ্চ আমি এটা জানতে চেষ্টা করেছি যে, কোন্ সূরা কোন্ সময় নাযিল হয়েছে। এ কারণেই আমি শিরোনামায়ও 'নাযিলের পর্যায়ক্রম' রাখিনি বরং নাযিলের সময়–কাল রেখেছি। সূরায়ে ওয়াকিয়ার ভূমিকায় আমি প্রথমতঃ 'আল–ইতকান' ও 'দালায়েলুন নবুয়াহ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ বর্ণনা করেছি যে, তোয়াহা, ওয়াকেয়াহ এবং আশ্–শোয়ারা কাছাকাছি সময়ে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। তারপর ইবনে হিশামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি যে, হযরত উমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের আগে তোয়াহা এবং ওয়াকেয়াহ নাযিল হয়। এ কথা ঐ শিরোনামের অন্তর্গত আলোচ্য বিষয় ছিল না যে, এ দু'টো সূরার মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে আর কোনটি পরে।

প্রাপক–
মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব,
আকূড়া খাটক, পেশাওয়ার।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৫১

৩০ আগষ্ট '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাশ্মীরের ব্যাপারে বিগত পঁচিশ বছর যাবত পাকিস্তানের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং সম্প্রতি ইসরাঈলের আঘাতের পর

আরব দেশসমূহের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আজও দুনিয়াতে "জোর যার মুল্লুক তার" এ নীতিই প্রচলিত আছে, আজও গায়ের জোরই সত্য। কোনো জাতি তার অধিকার সংরক্ষণের জন্যে আপন শক্তির ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউনাইটেড লীগ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বকে প্রতারণা করা হয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই এ কথা ফাঁস হয়ে গেল যে, তা কয়েকটি বৃহৎ শক্তির ষড়যন্ত্রের জাল মাত্র। অতপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় প্রতারণার প্রতিষ্ঠা হয় 'জাতিসংঘ' নামে। কিন্তু আজ এ কথা কারো কাছে গোপন নেই যে, এ সংস্থা গুটিকয়েক শক্তিশালী দেশের হাতের ক্রীড়নক মাত্র যা ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে নয় বরং নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যালেমকে যুলুম থেকে বিরত রাখা এবং মযলুমকে তার অধিকার দেয়া তো দূরের কথা এ সংঘ যালেমকে যালেম বলতেও প্রস্তুত নয়। বরং এখন তো প্রকাশ্যেই মযলুমকে "বাস্তববাদী" হবার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, মযলুম নিজের দুর্বলতা এবং যালেমের দৌরাত্মকে একটি বাস্তব ব্যাপার হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং যালেম অত্যাচারের ছত্রচ্ছায়ায় মযলুমের ওপর যে শোষণ-নিপীড়ন করে চলছে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করবে।

এ অবস্থায় এ আশা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক যে, কাশ্মীরে ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল আগ্রাসনের যে কালো হাত বিস্তার করে রেখেছে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি এর সমাধান করে দিবে। এখানে নৈতিকতার নয় বরং জংগলের আইন চালু রয়েছে। আল্লার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে আমাদেরকে নিজেদের শক্তি দিয়েই আগ্রাসীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার করতে হবে। আর তাদের প্রতিকার যখনই হবে তা তরবারীর জোরেই হবে।

প্রাপক- খাকসার,
সম্পাদক-সাপ্তাহিক 'এশিয়া' আবুল আ'লা
লাহোর।

পত্র — ১৫২

৩০ আগষ্ট '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ইসলামে কোনো নির্দিষ্ট পোশাক নেই। তবে কতিপয় নীতি আছে যেগুলোর অনুসরণ করা জরুরী সেগুলো হলো (১) পোশাক 'সতর' আবরণকারী হতে হবে। অর্থাৎ নারী পুরুষের শরীরের যে পরিমাণ অংশ ঢেকে রাখার শরয়ী নির্দেশ রয়েছে সে পরিমাণ পরিপূর্ণভাবে ঢেকে রাখতে হবে। (২) পুরুষ রেশমী কাপড় পরবে না। মেয়েরা এমন মিহি ও ফিনফিনে পাতলা পোশাক ব্যবহার করবে না যাতে তার শরীরের গঠন কাঠামো প্রকাশ পায়। (৩) পোশাক অহংকারী না হওয়া দরকার। এ কারণেই টাকনুর নীচে ঝুলন্ত পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (৪) পোশাকে কাফেরদের সাদৃশ্য থাকবে না। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এমন পোশাক পরিধান না করে যা দ্বারা তাকে মুসলমান বলে চিহ্নিত করা কঠিন হয় এবং দর্শক মনে করে বসে যে, সে ঐ কাফেরদেরই একজন যারা এ পদ্ধতির পোশাক পরিধান করে। মুসলমান যে দেশে বসবাস করে তাকে এমন পোশাক ব্যবহার করতে হবে যা সে দেশের মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। কাউকে এ পোশাকে আচ্ছাদিত দেখলে লোকেরা যেন চিনতে পারে যে, তিনি একজন মুসলমান।

প্রাপক—
মুহাম্মদ তোহা হোসাইন নদভী
অধ্যাপক, আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৫৩

৩০ আগষ্ট '৬৭

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার দুটো গ্রন্থই আমি পেয়েছি। ইনশাল্লাহ এগুলো পড়ে জরুরী পরামর্শ দেব। এগুলোর প্রকাশ সে সময় হবে যখন আপনি এগুলোকে দ্বিতীয়বার দেখে চূড়ান্ত রূপ দান করবেন। ইসলামিক পাবলিকেশন্সকে আমি বলে দেবো, তারা নিজেরাই যেন আপনার সাথে ফায়সালা করে নেয়।

ইংরেজীতে আপনি এমন একটি প্রবন্ধ রচনা করুন যার মধ্যে ইসলামের নাম না নিয়ে বলা হবে যে, সূদবিহীন ব্যাংকিং পদ্ধতি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং এ পদ্ধতি বর্তমান সূদী পদ্ধতির মুকাবিলায় কিভাবে অধিকতর উপকারী হতে পারে। এ প্রবন্ধটি ইউরোপ অথবা আমেরিকার কোনো গবেষণামূলক সাময়িকীতে প্রকাশ করাবেন। প্রবন্ধে এটাও লিখে দিন যে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পর্কীয় কাজের একটি বিশদ স্কীম আমি সংকলন করতে যাচ্ছি। তাতে বিজ্ঞ লোকগণ এ প্রস্তাবনার প্রত্যেকটি দিক ভালোভাবে যাচাই করতে পারবে। এ কাজ আপনি প্রথমে করুন। তারপর পূর্ণ বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিন।

'অংশীদারিত্ব ও মুদারিবা নীতি' এবং 'সূদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা' উভয়টির জন্যে পৃথক পৃথক গ্রন্থ হওয়া উত্তম। উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনবোধে একটি অপরটির উদ্ধৃতি দেবেন যাতে পাঠকগণ একটির সংক্ষিপ্ত সার অন্যটিতে পেয়ে যায়। কিন্তু এগুলো একত্রিত করে একস্থানে প্রকাশ করলে আলোচনা ঘোলাটে হয়ে যাবে।

লভ্যাংশে মতবাদের ওপর আপনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া খুবই উপকারী হবে। আল্লাহ না করুন ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ এর প্রকাশনায় প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

প্রাপক—
মুহাম্মদ নাযাত উল্লাহ সিদ্দিকি
আলীগড় (ভারত)।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৫৪

১৭ আগষ্ট '৬৮

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে দেয়া গেলঃ

একঃ বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–মধ্য প্রাচ্যের (Midle East) ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে অধিক বরকত আর কোনো যমীনে নেই। সেখানে কোনো নদী নেই, বৃষ্টিপাতও খুবই কম। কিন্তু ভূমি এতো উর্বর যে, শুধুমাত্র হাওয়ার আদ্রতা ও শিশির দ্বারা উৎকৃষ্ট ফসল ফলে।

দুইঃ মুলূকীয়াতের অর্থ হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা। এটা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে প্রয়োগ হলে আল্লার অভিশাপ এবং অভ্রান্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার হলে অনেক বড় নেয়ামত আছে।

প্রাপক—
সিরাজ আহমদ সাহেব
ছাদেকাবাদ।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৫৫

২২ জুলাই '৬৮

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। কমিউনিজম ও সোসালিজমের মুকাবিলা করা যতোটা সম্ভব সে ব্যাপারে আমরা অবিরত কাজ করে চলছি এবং ভবিষ্যতে কাজ করার প্রোগ্রাম বানিয়েছি। থাকলো সরকারের সাথে সহযোগিতা করার প্রসঙ্গ। আমরা আজ পর্যন্ত কোনো নেক ও সঠিক কাজে সরকারকে সহযোগিতা

করতে কার্পণ্য করিনি। কিন্তু ভ্রান্ত কাজে সহযোগিতা করা আমাদের জন্যে সম্ভব নয়।

প্রাপক—
সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন সাহেব,
করাচী।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৫৬

৫/এ যায়লদার পার্ক
ইছরা, লাহোর
১৭ জানুয়ারী '৬৮

(১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারী বিশ্ব শান্তি দিবস হিসেবে পালনের প্রাক্কালে ক্যাথলিক চার্চের পোপ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নিকট প্রেরিত এক বার্তায় ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে, শান্তি, পারস্পরিক সহাবস্থান, ধৈর্যের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বজনীন সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বার্তায় তিনি বিশেষ করে যুদ্ধ অবসানের আহবান জানান। মওলানা মওদূদী ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারী ভ্যাটিকানের ৬ষ্ঠ পোপ পলের কাছে এ বার্তায় জবাব প্রদান করেন।)

প্রিয় ৬ষ্ঠ পোপ পল[১],

১৯৬৭ সালের ৮ ডিসেম্বর লাহোরের লয়োলা হলের পরিচালক এবং আপনার সচিবালয়ের উপদেষ্টা ডঃ আর এ বাটলারের হাতে আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি পেয়েছি, যাতে আপনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের সাথে 'শান্তি দিবস' পালনের জন্য বিভিন্ন বড় ধর্মে বিশ্বাসী সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গোটা বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে আপনার এ আমন্ত্রণের মতো মহান

১. পত্রটি ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়েছিল।

উদ্যোগের জন্য আপনাকে হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে মানবতার শুভাকাংখী সকলের উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। 'শান্তি' হচ্ছে মানুষের অত্যাবশ্যক ও মৌলিক প্রয়োজনগুলোর একটি যা মানবকল্যাণের ভিত্তি রচনা করে। আমার মনে হয়, সকল প্রকার শুভ ইচ্ছা এবং শান্তির জন্য ভালোবাসার সুন্দর প্রকাশ ভঙ্গি সত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রকৃত অর্থে এ মহৎ আদর্শ কখনো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, যদি আদর্শকে সুষ্ঠুভাবে ও বাস্তবে কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া না হয়। সুতরাং আমার মতে এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে অথবা জাতিসমূহের গ্রুপ কিংবা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সৎভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে নিজস্ব চিন্তা ও অভ্যাসের দ্বারা উদ্দেশ্যকে বিচার করা উচিত। যদি তারা মনে করে, শান্তির জন্য বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাহলে তাদের উচিত অবিলম্বে তা প্রতিরোধ করা। অপরপক্ষে প্রত্যেকের সহজভাবে, শান্তভাবে ও ধৈর্যের সাথে অপরের বিরক্তি, তিক্ততা ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারী কার্যাবলী দেখিয়ে দিতে হবে, যাতে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি, জাতি অথবা সম্প্রদায় সংশোধিত হতে পারে এবং অনুশোচনা করে।

শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি এ চিঠির মাধ্যমে কিছু বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়গুলো মুসলমানদের গভীর অসন্তোষ ও বিরক্তির কারণ হয়েছে। আমি আশা করি আপনি আপনার সদিচ্ছা এবং খ্রীষ্ট সমাজের ওপর আপনার অপরিসীম প্রভাব কাজে লাগিয়ে বিশ্বে দু'টো প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্রমাবনতির কারণ দূরীভূত করার চেষ্টা করবেন। এ কারণগুলো বর্তমানে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায় হতে দূরে সরিয়ে দিয়ে উভয়ের সাধারণ শত্রুর সুযোগ করে দিচ্ছে।

আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, বিশ্বের কোন স্থানে মুসলমানদের দ্বারা যদি খ্রীষ্টান ভ্রাতৃবৃন্দের বিরক্তি বা অসন্তোষের কোন কারণ ঘটে থাকে, তাহলে আপনি সহজভাবে কোন কিছু গোপন না করে তা আমাকে অবহিত করবেন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার প্রভাব কাজে লাগিয়ে খ্রীষ্টান বিশ্বের অস্বস্তির কারণ দূর করার চেষ্টা করবো। আমার দৃষ্টিতে যে ন্যূনতম প্রয়োজন ছাড়া মানবতা কখনো শান্তির সাক্ষাত লাভের আশা করতে পারে না, তা হচ্ছে, যদি আমরা অন্যের সঙ্গে আচরণে বিবেচক ও উদার হতে না পারি।

তাহলে অন্তত ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করার মনোবৃত্তি পরিহার করা উচিত। অতিরঞ্জিত না করে আমি আপনার সমীপে খ্রীষ্টান ভাইদের কিছু তৎপরতাকে নজীর হিসেবে পেশ করতে চাই, যা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদেরকে আহত করেছে।

একঃ বহু শতক ধরে খ্রীষ্টান পণ্ডিত ও লেখকরা নবী করিম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), পবিত্র কুরআন এবং সাধারণভাবে ইসলামের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে। বর্তমানেও আক্রমণের ধারা অব্যাহত আছে। আমি আক্রমণ শব্দটা ব্যবহার করছি বিশেষ উদ্দেশ্যে, যাতে আপনি এ কথা মনে না করেন যে, আমরা আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে যৌক্তিক সমালোচনা শ্রবণ করতে প্রস্তুত নই কিংবা সমালোচনায় বিব্রত বোধ করি, বাস্তবে আমরা যুক্তিযুক্ত সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। এ সমালোচনা যত বিরূপই হোক না কেন, সদুদ্দেশ্যে কোন কিছু জানতে বা বুঝতে রুচি ও ন্যায়বোধ বজায় রেখে সমালোচনা করা হলে তাতে আমরা সন্দিগ্ধ হই না। আমরা যে জন্য অসন্তুষ্ট বা আপত্তি করি, সেগুলো অত্যন্ত অশোভন আক্রমণ এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অত্যন্ত বাজে অভিযোগ। আপত্তিকর ভাষায় আমাদের রসূল (সাঃ), পবিত্র কুরআন এবং আমাদের ধর্ম সম্পর্কে গালিগালাজ করা হয়। আপনি ভালভাবে জানেন যে, যীশু খ্রীষ্ট এবং তার মা মেরীর প্রতি মুসলমানদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। এদের কারো প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রদর্শনও আমাদের দৃষ্টিতে আল্লার প্রতি অবজ্ঞার শামিল এবং সেজন্য এ ধরনের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আপনি কোন মুসলমানের উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেখা বা বলা এমন একটি শব্দেরও উল্লেখ করতে পারবেন না, যার দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, যীশুখ্রীষ্ট বা তার মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা করার জন্য তা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই আমরা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা তার নবুয়াতে বিশ্বাস করি। ঠিক আমরা যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতে বিশ্বাসী। কেউ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুয়াতে বিশ্বাস করে যীশু খ্রীষ্টের নবুয়াতে আস্থা না আনা পর্যন্ত ইসলামে দাখিল হতে পারবে না। কিংবা তাকে ইসলামে বিশ্বাসী বলা যাবে না। অনুরূপ আমরা বাইবেল এবং তাওরাতকে আল্লার কিতাব হিসেবেই গ্রহণ করেছি, যেরূপ কুরআনকে আল্লার কিতাব হিসেবে মানি। কোন মুসলমান উপরোক্ত কিতাবের কোনটির প্রতি অবমাননাসূচক আচরণের কথা চিন্তাও করে না। যদি

মুসলমানরা সমালোচনার দৃষ্টিতে বাইবেল সম্পর্কে কিছু বলে বা লেখে তাহলে এ সবের বিষয়বস্তু খুজলে দেখা যাবে যে, এর সীমা বিষয়বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কে অনুমান মাত্র। আর এ অনুমান খোদ খ্রীষ্টান পণ্ডিত ও লেখকরাও করেছেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মোসেজ, যীশু খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য সকল নবী–রসূল যে আল্লার নিকট হতে অহীর মাধ্যমে দিক নির্দেশনা ও বাণী লাভ করতেন তা কোন মুসলমানই অস্বীকার করেনি এবং করবে না। বাইবেলে বর্তমানে আল্লার বাণী যে অবস্থায় আছে তা মুসলমানরা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু তারা এটা বিশ্বাস করে যে, এতে আল্লার বাণী রয়েছে। সেজন্য কোন মুসলমানই খ্রীষ্টনদের বিশ্বাসের কোন কিতাব বা নবীদের কারো প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করতে পারে না। বরং আমরা খ্রীষ্টান লেখক ও ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা অব্যাহতভাবে অবমাননা ও অযাচিত আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এটাই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিক্ততা ও বৈরীভাবের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল কারণ। খ্রীষ্টান লেখকদের মনোভাব শুধুমাত্র পারস্পরিক ঘৃণা এবং প্রধান দু' ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টিই করেনি বরং অব্যাহত বিষময় প্রোপাগাণ্ডা স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্টান জনগণের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শ্রেণী ও সম্প্রদায় হিসেবে গভীর ঘৃণার জন্ম দিয়াছে। আপনি যদি আপনার অনুসারী এবং সহধর্মাবলম্বীদেরকে অন্ততপক্ষে মুসলমানদের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতিকে ইচ্ছাকৃত অপমান ও আঘাত করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করেন, তাহলে বিশ্বশান্তি আন্দোলনে তা আপনার মহান অবদান হয়ে থাকবে।

দুইঃ খ্রীষ্টান মিশন এবং মিশনারীরা মুসলিম দেশগুলোতেই তাদের ধর্ম প্রচার এবং ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলেও মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। অন্যান্য দেশ এবং জাতির কাছে তারা কি ভাবে কি কাজ করে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, তারা মুসলিম দেশে শুধু ধর্ম প্রচারের মধ্যেই তাদের তৎপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি কিংবা সে সব দেশের জনগণকে খ্রীষ্টান ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগী করে তাদের চিত্তকে জয় করার চেষ্টাই চালাচ্ছে না। তারা এ থেকেও বহু এগিয়ে গেছে। তাদের কাজের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্টতই রাজনৈতিক চাপ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া তাদের শিকারদের অর্থনৈতিক অবস্থাকেও কৌশলে কাজে লাগাচ্ছে। সর্বোপরি তাদের

নৈতিকতাকে বিনষ্ট করা হচ্ছে। এ ধরনের পন্থাকে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে যুক্তির বিচারে ন্যায় বা অনুমোদনযোগ্য বলা যায় না। নজীর হিসেবে বলা যায়, আফ্রিকার দেশগুলোতে তারা খ্রীষ্টান উপনিবেশিক শক্তির সাহায্যে মুসলমানদেরকে শিক্ষা গ্রহণের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে। কেউ যদি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করে অথবা কমপক্ষে খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না করে তাহলে তার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়া হয়।

অতঃপর এভাবে খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুরা অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকান রাষ্ট্রের সামরিক বেসামরিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। আফ্রিকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে তাদের এহেন কর্মপন্থা যে সুস্পষ্টভাবে অন্যায় তা জোর গলায় বলতে কোন যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। মিশনারীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্য কথায় বলা চলে, মিশনারীরা প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশের বৃহৎ অঞ্চলকে মুসলিম বিরল করে প্রচারণার একচেটিয়া ক্ষেত্র পরিণত করেছে। মুসলমারা দেশের সে অংশে কোন জাগতিক উদ্দেশ্যেও প্রবেশ করতে পারে না, ইসলাম প্রচারের জন্য যাওয়া তো দূরের কথা। আমি মনে করি না যে, কল্পনাকে সুদূরপ্রসারী করলেও এভাবে কোন ধর্ম প্রচারকে যথাযথ, যুক্তিযুক্ত বা নৈতিক পন্থা বলে আখ্যা দেয়া যাবে।

পাকিস্তানে মিশন হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ তৎপরতা চালাচ্ছে। তারা মুসলিম রোগী ও ছাত্রদের নিকট হতে উচ্চহারে ফি আদায় করে থাকে। তাদের কেউ যদি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হয়, তাহলে তাকে বিনা খরচে বা নামমাত্র ব্যয়ে চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়া হয়। এটা যে ধর্ম প্রচার তা প্রমাণিত। এ হচ্ছে অর্থ ও বস্তুগত সুবিধার জন্য মানুষের বিবেক ও বিশ্বাসের সওদাবাজী। এ সব আক্রমণাত্মক তৎপরতা ছাড়াও মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে শ্রেণীর সৃষ্টি ও বিকাশ করেছে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে অনেকে মুসলমানিত্ব বর্জন করেছে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা সমাজে মানবতার অদ্ভুত নমুনা হয়ে বিরাজ করছে। আসলে তারা নৈতিকতা, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক বোধের সকল ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন। জনগণ এবং নিজ ভাষা হতে

বিচ্ছিন্ন এ সব লোক খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের সকল উদ্দেশ্য গুলিয়ে ফেলেছে ও নাস্তিক শক্তির বল বৃদ্ধি করছে, এ সঙ্গে লাগামহীনতারও লাইসেন্স পেয়েছে। কেউই এ কথা বলতে পারবে না যে, এগুলো ধর্মের কোন কাজ। এর ফলে প্রায় সব মুসলিম দেশে মিশনারী তৎপরতাকে ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতি ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখা হয়। আমি আপনাকে আবেগমুক্ত হয়ে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে, এ ধরনের মিশনারী তৎপরতার অশুভ পরিণতি এড়ানোর চেষ্টা করতে এবং মিশনগুলোকে সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছি।

তিনঃ উপরন্তু খ্রীষ্টান বিশ্ব সম্পর্কে মুসলমানদের সাধারণ ও সার্বজনীন মনোভাব হচ্ছে, খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পোষণ করে। মুসলিম জাতি এবং রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে খ্রীষ্টান জাতি ও তাদের সরকারদের ব্যবহার আমাদের অনুভূতিকে সজাগ করে তুলেছে। এ ব্যাপারে সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অবস্থা। ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশগুলো আরবদের ওপর বিজয় লাভে ইসরাইলকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং আনন্দ প্রকাশ করেছে, যার দরুন সারা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম আরবদের পরাজয়ে খ্রীষ্টান বিশ্বের উৎসব পালনের দৃশ্য দেখে ব্যথিত হয়নি, আপনি এমন একজন মুসলমানও পাবেন না। তারা এ ঘটনাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের মনের গভীরে প্রোথিত শত্রুতা হিসেবেই বিবেচনা করে। ইসরাইল রাষ্ট্রের অভ্যুদয় কিভাবে ঘটেছে অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে কিভাবে ইসরাইলকে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তিই সে সম্পর্কে অনবহিত নয়। আপনি জানেন যে, বিগত দু'হাজার বছর ধরে আরবরা ফিলিস্তিনে বাস করে আসছে। চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফিলিস্তিনে ইহুদী জনসংখ্যা শতকরা ৮ ভাগের অধিক ছিল না। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিয়েই বৃটিশ সরকার ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লীগ অব ন্যাশনস এ সিদ্ধান্তকে শুধু সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং বৃটিশ সরকারকে স্পষ্ট ম্যাণ্ডেট প্রদান করেছিল যে, তারা ফিলিস্তিনে ইহুদী এজেন্সীকে অংশীদারিত্বে গ্রহণ করবে এবং এ অপবিত্র পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে। অতপর সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদের জড়ো করে তাদেরকে তথাকথিত ইহুদী আবাসভূমিতে বসতি/

স্থাপন করানোর অভিযান পরিচালিত হলো। এ অভিযানের ফলে গত ৩০ বছরে ফিলিস্তিনে ইহুদী জনসংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। আমাদেরকে বলুন, অন্য একটি জাতির আবাসভূমিকে বলপূর্বক সম্পূর্ণ বিদেশী আরেকটি জাতির আবাসভূমিতে পরিণত করার কার্যের চাইতে অন্যায় এবং আগ্রাসন আর কি হতে পারে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে প্রকাশ্যে চাপ প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করে পাশ্চাত্য শক্তির আশীর্বাদে ইহুদীদের জন্য কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট আবাসভূমিকে ইসরাইল নাম দিয়ে একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে। জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ ইহুদী জনগোষ্ঠীকে ফিলিস্তিনের ৫৫ শতাংশ ভূখণ্ড বরাদ্দ করা হয় এবং ৬৭ শতাংশ আরব জনগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভূমির ৪৫ শতাংশের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ইহুদীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর দ্বারা সামরিক ও অন্যান্য সাহায্যে শক্তি অর্জন করে তাদের বরাদ্দকৃত ভূখণ্ডে সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না। বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অংশকে ৭৭ শতাংশে উন্নীত করে লাখ লাখ আরবকে গৃহহীন যাযাবরে পরিণত করলো। সংক্ষেপে এ হচ্ছে ইসরাইল রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ও প্রকৃত রূপ। বিশ্বের যে কোন স্থানের কোন সৎ এবং বিবেচক ব্যক্তি কি বলবে যে, ইসরাইল স্বাভাবিক ও বৈধভাবে জন্ম লাভ করেছে? এ রাষ্ট্রের টিকে থাকাটাও জঘণ্য ধরনের আগ্রাসন ছাড়া আর কিছু নয়। ইহুদীদের লোভ কোন সীমার মধ্য নেই। বল প্রয়োগে যে ভূখণ্ড তারা দখল করেছে তার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে মনে হয় না। বহু বছর থেকে তারা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে আসছে যে, তাদের জাতীয় আবাসভূমিকে নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করবে। এ লক্ষ্যেই ১৯৬৭ সালের জুন অভিযানে ইহুদীরা আরব ভূখণ্ডের ২৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে নিয়েছে। এটা তাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনারই অংশ। এ অবমাননা এবং অন্যায়ের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টান বিশ্বের উপরই বর্তায়। কারণ তারাই বলপূর্বক অন্য জাতির মাতৃভূমিতে এক বিদেশী সম্প্রদায়ের জাতীয় আবাসভূমি তৈরি করেছে। এরপর তারাই বিদেশী সম্প্রদায়ের তথাকথিত আবাসভূমিকে একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চাপ প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা এ অবৈধ রাষ্ট্রকে অস্ত্রসম্ভার, অর্থ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে এমনভাবে শক্তিশালী করেছে,

যাতে তারা বিনা প্রতিবন্ধকতায় তাদের আগ্রাসন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। মুসলিম আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইল যখনই বিজয়লাভ করেছে, খ্রীষ্টান বিশ্ব তাদের বিজয়ে আনন্দ উদযাপন করেছে। আপনি কি মনে করেন, এ সব কিছুর পরও একজন মুসলিম খ্রীষ্টান বিশ্বের শুভ বিশ্বাস, ন্যায়বিচারের প্রতি ভালোবাসা এবং ধর্মীয় ঘৃণা ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধে বলে দাবীর প্রতি আস্থা আনতে পারে? এ সব আচরণের মধ্যে কি প্রকৃতপক্ষে শান্তির কোন নিশানা আছে? প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কার্যকলাপ হতে খৃষ্টানদের নিবৃত্ত করা, তাদের লজ্জায় অনুভূতি জাগ্রত করার দায়িত্ব আপনার, আমাদের নয়।

চারঃ আশা করি আপনি আমাকে এ জন্য ক্ষমা করবেন, যদি আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপনার নিজের কিছু বাড়াবাড়ির কথাও উল্লেখ করি। আমি আপনাকে নির্দ্বিধায় বলছি যে, আপনার আন্তরিকতায় আমার কোনরূপ সন্দেহ নেই। সম্ভবত সবকিছু তলিয়ে দেখার মত যথেষ্ট সময় আপনার হাতে নেই। এখানে আমি জেরুসালেম নগরীকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্পর্কে আপনার প্রস্তাবের উল্লেখ করতে চাই। সম্ভবত আপনার মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আপনার সুপারিশকৃত বন্দোবস্তে এ পবিত্র নগরী সমভাবে নিরাপদ এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এ ছাড়া জেরুসালেম নগরী নিয়ে দ্বন্দ্বমান স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতি বিবাদ হতেও মুক্ত থাকবে। বিগত দিনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে, প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত খুব শীগগীরই আরেকটি অন্যায়ের আকারে অবস্থার অবনতি ঘটাবে। জেরুসালেমকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনার অর্থই হচ্ছে নগরীকে সে আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা। যে সংস্থা অন্যায়ভাবে কৃত্রিম রাষ্ট্র ইসরাঈলকে সৃষ্টি করেছিল এবং যে সংস্থা কখনো ইসরাঈলকে আগ্রাসন হতে বিরত রাখতে পারেনি। অথবা রাষ্ট্রটি চালু করার পর তা বিলোপও করতে পারেনি। অতএব নগরীকে যদি সে সংস্থার হাতেই ন্যস্ত করা হয়, তাহলে তারা নিশ্চিতই পবিত্র নগরীর ফটকগুলো ইহুদী বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে এবং ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ আহরণে তাদেরকে সকল সুবিধা প্রদান করবে, যেমনটি তাদের ম্যাণ্ডেটের সময় বৃটিশ সরকার করেছিল। এভাবে এ পবিত্র নগরী আগামী কয়েক বছরেই পুরোপুরিভাবে ইহুদী জনপদে পরিণত হবে এবং আপনি ভালোভাবেই অবগত যে, ইহুদীরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের মধ্যে মুসলমান বা খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলো সম্পর্কে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই।

আশা করি আপনার চিঠির সুদীর্ঘ ও অকপট জবাব দেয়ার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত সততার সাথে আমার দৃষ্টিতে শান্তির পথে প্রকৃত প্রতিবন্ধকতাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করাকে আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি এবং 'বিশ্ব শান্তি' প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে এ প্রতিবন্ধকতা–গুলো দূর করা জরুরী বলে অনুভব করেছি।

পরিশেষে আমি আপনাকে অনুরোধ করতে চাই, যদি কোথাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের খৃষ্টান ভাইদের কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় কিছু গোপন না করে আমাদেরকে অবহিত করুন, ঠিক যেভাবে আমি এ চিঠিতে করেছি। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, এ অভিযোগগুলোর প্রতিকার করতে আমি শুধু আমার প্রভাবই কাজে লাগাব না, বরং মুসলিম বিশ্বের অন্যদেরকেও অনুরূপ প্রভাব কাজে লাগাতে অনুরোধ করবো।

আপনার
আবুল আ'লা মওদূদী

পত্র – ১৫৭

৪ জানুয়ারী '৬৮

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা নিয়ে আপনার প্রেরিত ঈদকার্ড আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। জবাবে আমার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। পরিতাপের বিষয় যে, এ ঈদে মসজিদে আকছা, বাইতুল মাকদাস ও আল খলীলের জন্যে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমাদের ঈদ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ঈদের খুশী হতে পারবে না যতোক্ষণ না, আমরা আমাদের নিজেদের পবিত্র স্থানগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবো।

খাকসার,
আবুল আ'লা

প্রাপক
The Fedaration of the students
Islamic Societies, London.

পত্র — ১৫৮

২ ফেব্রুয়ারী '৬৮

মুহ্‌তারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

আমি আপনার আমন্ত্রণের জবাবে ওয়াদা করেছিলাম যে, নযুলে কুরআনের চতুর্বিংশে সম্মেলনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করব এবং সম্মেলনে পেশ করার জন্যে আপনার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর ওপর একটি প্রবন্ধ তৈরি করে নিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বিগত কয়েক মাস থেকে যে জোড়ার ব্যাথায় কষ্ট ভুগে আসছি তা গত রামাদান মাস থেকে সাংঘাতিক রকম বেড়ে যায় এবং এখনও বেড়েই চলেছে। এর ফলে সফর করা আমার জন্যে দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মানসিক পরিশ্রমও অতি অল্প করতে পারি। এ কারণে প্রবন্ধ তৈরি করতে পারিনি এবং আপনার সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারব না বলে ওজর পেশ করছি। —

আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি সম্মেলনে উপস্থিত সকলের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দেন এবং এ বার্তা পৌঁছে দেন যে, আপনারা যে মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এ সম্মেলনে একত্রিত হয়েছেন তাতে আমি মনেপ্রাণে আপনাদের সাথে শরীক আছি। আমি কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে কালামে পাকের সঠিক অর্থ বুঝতে এবং এ নাজুক সময়ে এর সঠিক প্রচার এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এর শিক্ষা সঠিক পন্থায় অনুসরণের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তায়াল এ ঘোষণা দিয়ে আখেরী নবীর ওপর নিজের কিতাব নাযিল করেন যে, এর মধ্যে দ্বীনের পরিপূর্ণতা দান করা হলো। এখন আর কোনো নবী এবং কিতাব আসবে না। এ কথার স্বাভাবিক অর্থ হলো কুরআন সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের গোটা মানবজাতির জন্যে একটি স্বতন্ত্র হেদায়াত। কেননা যদি কুরআনের হেদায়াত কোনো যুগ, ভূখণ্ড কিংবা মানব সমাজের কোনো অবস্থার জন্যেও অপর্যাপ্ত কিংবা অপূর্ণাঙ্গ হতো তবে এর অর্থ হতো এ যে আল্লাহ তায়ালার এ ঘোষণা ভুল। অথচ আল্লাহ তায়ালা ভুল থেকে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র। সুতরাং মুসলমান হিসেবে জীবন সমস্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের পহেলা দৃষ্টিভঙ্গী এটাই হবে যে, আমাদের হেদায়েতের মূল উৎস হলো এ কিতাব—আল-কুরআন। পথ নির্দেশনার জন্যে আমরা এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। দৃষ্টিভংগির এ

সূচনাবিন্দুর প্রশ্নটিই এ সময় সারা বিশ্বের মুসলমানদের চিন্তাবিদ , গবেষক ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্যে মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। যদিও আমাদের আসল কাজ হলো খোদায়ী হেদায়াতের দিকে দুনিয়াবাসীকে ডাকা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নব্য ব্যক্তি তাত্ত্বিকতার বিশ্বগ্রাসী প্রভাব আমাদের নিজেদের মধ্যে এ প্রশ্নের সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে পথনির্দেশের মূল উৎস হিসেবে স্বীকার করছি কি করছি না? আর যদি স্বীকার করেও থাকি, তবে বুঝে শুনে নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করছি কিনা? এ কারণে আমরা মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব বিশ্বজনীন মর্যাদার অধিকার ততোক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবো না, যতোক্ষণ না আমরা এ প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবো। আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান হবো যদি এ প্রশ্নের একটি আকাট্য ও সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে নুযুলে কুরআনের পঞ্চবিংশ শতাব্দীর যাত্রা শুরু করি।

আমাদের পথপ্রদর্শক ও পথিকৃত মহলের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা একালে কুরআনকে হেদায়াতের আসল উৎস স্বীকার করে না। অথবা এ ব্যাপারে তারা অন্ততঃ সন্দেহে লিপ্ত। তারা এমন সন্তোষজনক দলিল–প্রমাণের প্রত্যাশী যাতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, পথনির্দেশনার জন্যে মানুষ আল্লার হেদায়াতের মুখাপেক্ষী এবং এ কুরআন সত্যিই আল্লার তরফ থেকে একটি সংরক্ষিত, পরিপূর্ণ ও চিরন্তন হেদায়াত। কিছু অন্য ধরনের লোকও আছে যারা দীন ও দুনিয়াকে ভাগ করার দর্শন গ্রহণ করেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দিষ্ট চিন্তাধারা অনুযায়ী যে বস্তুকে দীন মনে করে নিয়েছে, শুধু ঐ সীমা পর্যন্তই তারা কুরআনের হেদায়াতকে সীমিত রাখতে চায়। এ ধরনের লোকদের ভুলের অপনোদন ততোক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ না দীন ও দুনিয়ার এ নিরর্থক ভাগাভাগি মিটিয়ে দেয়া হবে এবং অকাট্য যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করা হবে যে, মানুষ তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কুরআনের হেদায়াতের মুখাপেক্ষী। কুরআন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সম্পূর্ণ সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

কিছু লোক আছে যারা কুরআনের হেদায়াতকে সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন হিসেব স্বীকার করে। কিন্তু যখন তা অনুসরণের প্রশ্ন আসে তখন আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কারো কারো জন্যে পথ নির্দেশনার উৎস ও উপাদান কুরআন

বহির্ভূত অন্য কোন স্থান যেখান থেকে চিন্তা ও দর্শন গ্রহণ করে তারা কুরআন দ্বারা তাকে সত্যায়িত ও নির্ভরযোগ্য করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। কারো প্রচেষ্টা এই যে, কুরআনের সম্পর্ক কেবলমাত্র রাসূলের সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন করেই নয় বরং বিগত ১৪শ বছরে ওলামা, ফোকাহা ও তাফসীরকারগণ কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা উদ্ভাবনমূলক যেসব কাজ করেছেন সেগুলোকে বাদ দিয়ে কুরআনের শব্দাবলী তাদের জ্ঞান প্রসূত যে তাৎপর্য বহন করে শুধু তা দিয়ে হেদায়াত অর্জন করা। এ উভয় পথ এমন যাকে কোনো জ্ঞানবান লোক কুরআনের হেদায়াত থেকে উপকৃত হওয়ার সঠিক পন্থা বলে স্বীকার করতে পারে না। এবং সেগুলোর ভিত্তির ওপর মুসলিম জাতির কোনো চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি গঠিত হতে পারে না। কেননা মুসলিম জাতির সামষ্টিক মস্তিষ্ক কখনো এ ব্যাখ্যা ও তাফসীর গ্রহণ করতে পারে না। এবং স্বয়ং তাদের মধ্যেও তাদের সব তাবীরের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে এ ধরনের পথ ও মতের প্রসারতায় মুসলমানদের মধ্যে আরো বিভেদ বিচ্ছিন্নতার প্রসার হওয়া ছাড়া আর কোনোই কল্যাণ নেই। তাদের মস্তিষ্কে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়। দুনিয়াবাসীকে আল্লার হেদায়াতের দিকে আহবান করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই নিজেদের স্থানে এ পেরেশানীতে নিমজ্জিত যে, তারা সত্যিই হেদায়াতের ওপর আছে কি? কিন্তু এদের প্রতিকার গালমন্দ এবং তিরস্কার-ভৎর্সনা দ্বারা দোষ দেয়া ঠিক নয়। বরং এ সব লোক যে জিনিসের মুখাপেক্ষী তা হচ্ছে যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআনের হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সঠিক পন্থা তাদেরকে বলা হবে এবং তাদের গৃহীত পন্থা ভুল তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে।

পদস্খলনের এ সব ক্ষেত্র থেকে যারা বেঁচে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতের উৎস হিসেবে কুরআনকে স্বীকার করতে তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি কতটুকু কাজে লাগায়? এ ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির অর্থ শুধু এ নয় যে, আমরা কুরআন সম্পর্কে একনিষ্ঠভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করবো যে, হেদায়াতের উৎস আর এর অর্থ এটাও নয় যে, আমরা এ বিশ্বাসের ঘোষণা ও প্রচারকেই যথেষ্ট মনে করবো। বরং আমাদের বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী হবার আসল দাবী এই যে, আমরা আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে হেদায়াতের এ উৎসের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবো। কুরআন যে পথের নির্দেশনা দেয় সে মোতাবেক নিজেদের

জীবন পদ্ধতি নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ ও লেনদেন পরিচালনা করবো এবং স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে কার্যতঃ কুরআনী নীতির ছাঁচে গড়ে তুলবো। আমার অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা হলো, আমাদের নেতা ও কর্তা মহলেরও যারা সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী, তাদের মধ্যেও নেতৃত্ব সুলভ বিবেক বুদ্ধি অনুপস্থিত। আর যদি অনুপস্থিত না হয় তবে কাংক্ষিত মান থেকে তা অনেক নিম্নে। আমাদের মধ্যে এ বুঝ ও বিবেক বুদ্ধি সৃষ্টি করতে সর্ব প্রথম চেষ্টা করতে হবে। কারণ যতক্ষণ না এ অনুভূতির সৃষ্টি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনের ক্ষেত্র সমূহকে কুরআনী শিক্ষা কার্যকর করার তাত্ত্বিক আলোচনাসমূহ কেবল কাগজেরই শোভা বর্ধন করবে। কার্যক্ষেত্রে তা নিষ্ফলই থেকে যাবে। তাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা বিশ্ব ইসলামকে সত্য জীবন ব্যবস্থা বলে স্বীকার করতে পারে না। বিশ্ববাসীকে ইসলামের বাস্তবতা স্বীকার করাতে হলে আমাদের জাতীয় জীবনে অবশ্যি ইসলামের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এটা ছাড়া আমরা ইসলামের যতোই তাবলীগ করি না কেন তার সামনে দেখা যাবে বিশ্ববাসীর এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

এ চিহ্নের মধ্যে এ প্রশ্নটি লুকায়িত থাকবে যে, এ উম্মাহর, মসজিদের বাইরে যে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরের চিন্তা, মতাদর্শ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও নীতিমালার অন্ধ অনুকরণ করছে, তারা নিজেরাই কি ইসলামকে সঠিক সত্য জীবন ব্যবস্থা মনে করে?

আমি এ কটি বিষয়ের প্রতি আলেমগণের এ মহতী সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আশা করি এগুলোকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত মনে করা হবে।

প্রাপক— খাকসার,

ডঃ ফজলুর রহমান সাহেব, আবুল আ'লা

ডিরেক্টর, ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামীয়া, রাওয়ালপিণ্ডি।

পত্র — ১৫৯

১৮ ফেব্রুয়ারী '৬৮

মুহতারামী ও মুকরারামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি কেবল গালিবের কথারই প্রশংসাকারী নই বরং তাঁর সাথে আমার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কও আছে। আমার নানা মরহুম মির্জা কুরবান আলী বেগ সালেক তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর বাসাও দিল্লীতে আমার নানার বাসার সংলগ্ন ছিল। এভাবে আমার জন্মই হয় এমন বংশে যারা কেবল গালিবের কথারই ভক্ত ছিলেন না বরঞ্চ তাঁর সাথে খুবই নিকটের সম্পর্ক ছিলো।

ছোটবেলা থেকেই আমি তাঁর লেখার খুব ভক্ত ছিলাম। আমি তাঁকে পাক-ভারেতের নয় সারা বিশ্বের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম মনে করতাম। এটা আমাদের সৌভাগ্য ছিল যে, আমাদের মাঝে এমন একজন নজিরবিহীন কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে। আর এটা তার জন্যে দুর্ভাগ্য ছিল যে, তিনি একটি পশ্চাদপদ জাতির অবনতির ক্রান্তি লগ্নে পয়দা হয়েছেন যার কারণে কবিতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্ব আজ পর্যন্ত তাঁকে এতোটুকু মর্যদায় ভূষিত করেনি। যে মর্যাদায় তার চেয়ে অনেক নিম্ন শ্রেণীর কবিগণ শুধু এ কারণে ভূষিত হয়েছেন যে, তাঁদের আবির্ভাব একটি জীবন্ত জাতির মধ্যে ঘটেছে।

প্রাপক—
ডঃ আফতাব আহমদ সাহেব,
সেক্রেটারী, গালেব স্মরণিকা মজলিশ,
পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, লাহোর।

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র — ১৬০

১৯ ফেব্রুয়ারী '৬৮

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনার চিঠি পেয়েছি। জেনে খুশী হলাম যে, আপনি শাহ ওলী উল্লাহ সাবের রেখে যাওয়া ইলম ও শিক্ষাসমূহের প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছেন। আমি এর শুভ কামনা করছি। আল্লার কাছে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করছি, তিনি এ কাজের জন্যে আপনাকে শক্তি ও সামর্থ দান করুন। আমি ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮ ইং) ঢাকা যাচ্ছি। আজকাল আমি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে আছি। তাই শাহ সাহেব সম্পর্কে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখা আমার জন্যে দুষ্কর, তবুও আপনার তাকীদের কারণে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বক্তব্য আপনার খেদমতে পাঠালাম।

হযরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানীর ওফাতের পর বাদশাহ আলমগীরের ইন্তেকালের ৪ বছর পূর্বে ১১২৪ হিঃ মোতাবেক ১৭০৩ সালে দিল্লীর উপকণ্ঠে শাহ ওলীউল্লাহ সাবের জন্ম হয়। একদিকে তাঁর যুগ ও পরিবেশকে অন্যদিকে তাঁর কাজকে মুখোমুখিভাবে রেখে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কেননা এমন যুগ ও পরিস্থিতির মধ্যে এমন উচ্চমানের দৃষ্টিভংগী, চিন্তাধারা ও মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির সৃষ্টি কেমন করে হতে পারে, যিনি যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করেন। অন্ধানুকরণ এবং শত শত বছরের পুঞ্জীভূত গোঁড়ামীর বন্ধন ছিন্ন করে জীবনের প্রতিটি বিষয়ের ওপর গবেষণা ও সংস্কারমূলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি এমন লেখনী ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন যার ভাষা, বর্ণনা রীতি, চিন্তাধারা দৃষ্টি ভংগী উপকরণ এবং উদ্ভাবনী দৃষ্টি সমূহ প্রভৃতি কোনোটির ওপরই পরিবেশ ও পরিস্থিতির কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি এ সাহিত্যের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টালে এ ধারণা পর্যন্ত হয় না যে, এ সব জিনিস এমন জায়গায় বসে লেখা হয়েছে যার চতুর্পার্শে বিলাসিতা, প্রবৃত্তির পূজা, হানাহানি, জোর-যুলুম, ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলার তুফান বইছিল।

শাহ সাহেব মানবেতিহাসের ওসব নেতাদের অন্যতম যারা চিন্তাধারার আবর্জনাময় জংগলকে পরিষ্কার করে চিন্তা ও দর্শনের একটি স্বচ্ছ সহজ সরল মহা সড়ক তৈরি করেন। মস্তিষ্ক রাজ্যে বর্তমানে বিরাজিত অস্থীরতার বিপরীতে এমন আকর্ষণীয় নব নির্মাণের নক্সা তৈরি করেন যার ফলে অমংগলের বিলুপ্তিতে এবং মংগলের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক অবশ্যম্ভাবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এ ধরনের নেতা নিজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী নিজেই কোনো আন্দোলন দাঁড় করিয়ে সমাজের বিকৃতি বিদূরিত করে নিজ হাতে বিপ্লবের জন্যে ময়দান গড়ে তুলেছেন, ইতিহাসে এরূপ নজীর খুব কমই পাওয়া যায়। এ

ধরনের নেতাদের আসল কৃতিত্ব এটাই হয়ে থাকে যে, তাঁরা সমালোচনার মাধ্যমে শত-সহস্র বছর ব্যাপী পুঞ্জীভূত হয়ে থাকা ভুল ধারণা সমূহের মূলোৎপাটন করে মানুষের মন-মগজেও চিন্তার জগতে দিগন্ত উন্মোচন করে দেন। মানুষের মন-মগজে জমে যাওয়া ভ্রান্ত ধারণাসমূহ চিন্তার বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে বিচূর্ণ করে দিয়ে মৌল ও প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ তাদের সামনে উন্মুক্ত করে রেখেছেন।

শাহ সাবের সংস্কারমূলক কার্যাবলী আমরা দু'টি শিরোনামে ভাগ করতে পারি। একটি সমালোচনা ও গবেষণামূলক অন্যটি 'গঠন মূলক'। প্রথম শিরোনামের ব্যাপারে শাহ সাহেব ইসলামের সমগ্র ইতিহাসের ওপর সমালোচনামূলক দৃষ্টি দিয়েছেন। আমি যতটুকু জানি, শাহ সাহেবই প্রথম ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ও সূক্ষ্ম তারতম্য ধরা পড়ে এবং তিনিই মুসলমানদের ইতিহাসের ওপর ইসলামের ইতিহাসের দৃষ্টিভংগীতে ভালো-মন্দের যাচাই করে এটা জানতে চেষ্টা করেছেন যে, অনেক শতাব্দী থেকে ইসলাম গ্রহণকারী জাতিগুলোর মধ্যে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কি অবস্থায় আছে। শাহ সাহেবের পর এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নজরে পড়ে না যার মস্তিষ্কে মুসলমানদের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র করে ইসলামের ইতিহাসের কোনো সুস্পষ্ট চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। শাহ সাহেবের লেখায় বিভিন্ন স্থানে এতদসম্পর্কীত ইংগিত পাওয়া যায়। ইযালাতুল খিফায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বৈশিষ্ট্যসহ মুসলমানদের ইতিহাসের পর্যালোচনা করেন। তাঁর বর্ণনার সৌন্দর্য হলো তিনি একেকটি যুগের বৈশিষ্ট্য ও একেকটি যামানার ফেতনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও বর্ণনা করেন যেগুলোতে এ অবস্থার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগীত পাওয়া যায়। এ পর্যালোচনায় জাহেলী যুগের প্রায় সমস্ত দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করা হয় যা মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ইল্‌ম, চরিত্র, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে মিশে গিয়েছিল।

পুনর্গঠন প্রসংগে তাঁর প্রথম গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এ ছিলো যে, তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রে একটি মধ্যম পন্থা পেশ করেন যাতে কোনো মাযহাবের পক্ষপতিত্ব এবং অন্য মাযহাবের দোষ খুঁজে বের করা হয়নি। একজন গবেষকের মত তিনি সমগ্র ফেকহী মাযহাবের নীতিমালা ও উদ্ভাবন পদ্ধতিসমূহের অধ্যয়ন করে

সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো মাযহাবের কোনো মাসয়ালা সমর্থন করলে তা এ জন্যে করেছেন যে তার পক্ষে দলিল-প্রমাণ রয়েছে। সে মাযহাবের পক্ষে ওকালতী করার জন্যে নয়। আর যেখানে মতবিরোধ করেছেন তা এ কারণে করেছেন যে, এর বিপক্ষে তিনি দলিল প্রমাণ পেয়েছেন। শত্রুতা বা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তিনি তা করেননি। এ কারণেই তাঁকে কোথাও হানাফী কোথাও শাফেয়ী, কোথাও মালেকী বলে লক্ষ্য করা যায়।

তিনি ওসব লোকদের সাথেও মতবিরোধ করেছেন যারা কোনো একটি মযহাবের অনুসরণের শিকল গলায় পরে সর্ববিষয়ে তাকেই অনুসরণের শপথ নিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি ওসব লোকদের সাথেও কঠোর মত-পার্থক্য করেন যারা মাযহাবের ইমামদের মধ্য থেকে কারো বিরোধিতা করার শপথ করেছে। এতোদুভয়ের মাঝখানে তিনি এমন একটি মধ্যম পন্থার অনুসরণ করেন যার মধ্যে প্রত্যেক নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি সন্তোষ ও আশ্বস্তি লাভ করতে পারেন।

এ মধ্য পন্থা গ্রহণ করার উপকারিতা এই যে, এতে গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা, অন্ধানুকরণ ও অর্থহীন তর্ক বহছের মাধ্যমে সময়ের অপচয় বন্ধ হয়ে যায় এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভংগীর সাথে সাথে গবেষণা ও উদ্ভাবনীর পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

উপরোল্লেখিত দু'টি কাজ তো এমন যা শাহ সাহেবের আগের লোকেরাও করেছেন। কিন্তু যে কাজ তাঁর আগে কেউ করেনি তা হলো, তিনি ইসলামের চৈন্তিক, নৈতিক, শরয়ী ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে সুশৃংখলরূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। এ কাজটি ছাড়াই তিনি পূর্ববর্তী সকলকে অতিক্রম করেন। যদিও প্রাথমিক তিন চার শতাব্দীতে এমন অনেক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের কাজ দেখলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মন-মগজে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র বিদ্যমান ছিল। এমনি ভাবে পরবর্তী শতাব্দীতেও এমন গবেষকদের অবির্ভাব ঘটে যাদের সম্পর্কে এমন ধারণা করা যায় না যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক এ-চিত্র থেকে মুক্ত ছিলো। কিন্তু তাদের কেউই সামগ্রিক ও যুক্তিসংগতভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করার প্রতি দৃষ্টি দেননি।

এ কেবল শাহ সাহেবই এ পথে পা বাড়ান এবং এ মহান মর্যাদা লাভ করেন। শাহ সাহেব জাহেলী শাসন ব্যবস্থা ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পার্থক্যও সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে লোকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি কেবল ইসলামী হুকুমাতের বৈশিষ্ট্য সমূহই পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করেননি, বরং এ বিষয়টিকে বার বার এমন এমন পদ্ধতিতে পেশ করেছেন যার ফলে জাহেলী হুকুমাতকে ইসলামী হুকুমতে পরিবর্তন করার আপ্রাণ চেষ্টা-সংগ্রাম না চালিয়ে বসে থাকা ঈমানদার লোকদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা কিতাবেও এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ এসেছে। আর ইযালাতুল খিফা তো যেন এ বিষয়েরই ওপর লেখা হয়েছে। এ কিতাবে তিনি হাদীসের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী খেলাফত ও রাজতন্ত্র দু'টি স্বতন্ত্র ও পৃথক জিনিস উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। তারপর তিনি একদিকে রাজতন্ত্রের ওসব ত্রুটিগুলো উল্লেখ করেন যেগুলো রাজতন্ত্রের সাথে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে ইতিহাস হিসেবে জন্মলাভ করে। অন্যদিকে ইসলামী খেলাফতের বৈশিষ্ট্যসমূহ এর শর্তাবলী এবং সে সব রহমতের কথা উল্লেখ করেন যেগুলো ইসলামী খেলাফত আমলে বাস্তবিকই মুসলমানরা লাভ করেছিল।

পাবেন — খাকসার,
শাহ মুহাম্মদ রহমান আনছারী সাহেব, আবুল আ'লা
এডভোকেট,লাহোর।

পত্রঃ ১৬১

১ মে '৬৮

স্নেহবরেষু

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

৩ এপ্রিল আপনার চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে এ খবর জেনে খুব খুশী হয়েছি যে, আপনি হাসানাইন সাহেবের ছেলে।[১] এ কথায় আরো খুশী হয়েছি যে,

১. হাসনাইন সাহেব জামায়াতে ইসলামীর প্রধান রোকনদের অন্যতম। বিভাগপূর্বকালে তিনি একনিষ্ঠ তড়িৎকর্মী রোকন ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী, ভারত এর সাথে তার সম্পর্ক (সংকলন)

আপনি স্বীয় পিতার সৌভাগ্যবান সন্তান। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সঠিক পথে দৃঢ় রাখুন এবং আপনাকে দ্বীনের সঠিক খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আপনার পিতাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম লিখে পাঠাবেন।

নাইজেরিয়ার মুসলমানদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে খুবই সংকটাপন্ন। ইসলামের সেবকগণ কয়েক শতাব্দী থেকে সেখানে দ্বীন প্রচারের জন্যে যে কাজ করেন তা সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার মিশনারীদের অবিচার এবং স্বয়ং মুসলমানদের অজ্ঞতায় একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।

এ জাতিটি আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হতে চলছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে আগত মুসলমানদের সেখানে যা কিছুই করা সম্ভব তা অবশ্যি করা উচিত। অপরাধী সে ব্যক্তি যে সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র উপার্জনের চিন্তায় বিভোর। আর ইসলামের এ পুঁজিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর কোনো চিন্তাই সে করে না।

বর্তমানে পাকিস্তান থেকে আগত কতিপয় যুবক নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অংশে কাজ করছে। আমি তাদের ঠিকানা আপনাকে লিখে দিচ্ছি। তাদের সাথে যোগাযোগ করে সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং এটাও জেনে নিন্ যে, তারা কিভাবে কাজ করছে এবং তাদের জানামতে নাইজেরিয়ার অভ্যন্তরে কোথায় কোথায় পাকিস্তান ও ভারতের এমন লোক আছে যারা একাজে তাদের সাথে সহযোগিতা করছে?

আপনাকে সেখানে দু'পদ্ধতিতে কাজ করতে হবেঃ

একঃ নিজেদের স্কুলের ছাত্রদের মাঝে। তাদেরকে শুধুমাত্র শিক্ষাই দিবেন না। বরং তাদের সাথে গভীর সহানুভূতি মূলক সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আগ্রহী হোন। তাদেরকে বুঝতে দিন যে, আপনি আন্তরিকভাবে তাদের হিতাকাংখী। বিদ্যালয় চলাকালীন অন্য সময় ছাড়াও তাদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য করুন, এভাবে গোটা বিদ্যালয়ে আপনার নৈতিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠা হবে। তারপর যে শিক্ষাই আপনি তাদের দেবেন তারা তা গ্রহণ করবে। তাদেরকে নামায জামায়াতের সাথে আদায়ে অভ্যস্ত করবেন। নামাযের হাকীকত তাদেরকে বুঝাবেন। তাদের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে

জানার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগাবেন এবং এমন সাহিত্য সরাবরহ করবেন যা দ্বীন সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

দুইঃ যে শহরে আপনি অবস্থান করছেন সে শহরের সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষতঃ তাদের প্রভাবশালী ও মর্যদাবান লোকদের সাথে মিশবেন। তাদের মসজিদে যাবেন এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমেও তাদেরকে সম্বোধন করবেন। তাদেরকে ইসলামী সাহিত্য পড়াবেন। যাতে করে তারা সাম্মিলিতভাবে নিজেদের সমাজে কার্যতঃ মৃত প্রায় ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্যে কিছু করতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর যখন তারা আগ্রহী হবে তখন তাদের মাধ্যমে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানে ইসলামী পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং সাহিত্য সাধারণ পাঠকদের জন্যে রাখার ব্যবস্থা করবেন। কমপক্ষে এমন একটি এজেন্সি কায়েম করুন যে বাহির থেকে ইসলামের ওপর ইংরেজী সাহিত্য এনে বিক্রি করবে। অবশ্য নাইজেরিয়ায় লেখা পড়া জানা সকল লোকের জন্যে বাহির থেকে বিনামূল্যে সাহিত্য সরবরাহ করা দুরূহ ব্যাপার।

আমি আপনার কাছে কিছু কিতাব পাঠাচ্ছি। আপনি যদি কুয়েতের আবদুল্লাহ আল-আকীল সাহেবকে সহযোগিতার জন্যে লিখেন তবে আশা করি ইন্‌শাল্লাহ্ তিনি আপনার কাছে অনেক সাহিত্য পাঠাবেন। তাঁকে নাইজেরিয়ার অবস্থা স্ববিস্তারে লিখুন এবং আপনার প্রয়োজন তাকে অবগত করুন।

জুলকারনাইন সাহেব এম. এ. খাকসার,
মুসলিম হাইস্কুল, শিগামু,পশ্চিম নাইজেরিয়া, আবুল আ'লা
আফ্রিকা।

পত্র — ১৬২

২৮।২ ।৮

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমি অনুতপ্ত যে, মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া কিংবা পয়গাম পেশ করতে

পারলাম না। আমার স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে এবং গত কয়েকদিন যাবত আমার স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি বোধ করছি। কারণ একাধারে বেশ কয়েকদিন আমি জামায়াতে ইসলামীর মসলিশে সূরা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মিটিং সমূহে অংশগ্রহণ করে ছিলাম।

মাওলানা রেজা খান সাহেবের ইলম ও মর্যাদার প্রতি আমার অন্তরে বিরাট সম্মান রয়েছে। ইলমে দীন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল বাস্তবিকই দিগন্ত প্রসারী। তাঁর প্রতিপক্ষ লোকেরাও তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিতর্কিত বিষয়ের কারণে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় যার উল্লেখ আপনি নিজেও আমন্ত্রণ কার্ডে করেছেন —এ তিক্ততাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইলমী কামালাত এবং দীনি খেদমাতের ওপর যবনিকাপাতের অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব বুযর্গের লেখার ওপর তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয় তারা তো এখন আপন প্রভুর কাছে চলে গেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে তিক্ততা ও উষ্ণতা শুরুতে সৃষ্টি হয়েছিল দু'পক্ষ থেকেই সেগুলো উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

আপনারা যারা মরহুম মাওলানার সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন আপনাদের কর্তব্য হলো ওসব তিক্ততার অবসান করা এবং এ অনর্থক বিতর্কের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা এবং বিতর্কিত মাসায়েলগুলো আলাপ-আলোচনার বাইরে রেখে মরহুম মগফুর মাওলানার ইলমী খেদমাতের সাথে সাধারণ মুসলমানদের পরিচয় করা।

প্রাপক—
মওলানা কাযী আবদুন নবী কাওকাব সাহেব
প্রধান, মজলিশে সাদাকাতে ইসলাম, লাহোর।

খাকসার'
আবুল আ'লা

পত্র – ১৬৩

৪ জনু '৬৮

ভাই মাহের সাহেব,

আসসলামু আলাইকুম ওরা রাহমাতুল্লাহ্।

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার স্বাস্থ্য এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি। চিকিৎসা চলছে এবং এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি যে, চিকিৎসার জন্যে বাহিরে

যেতে হবে কি হবে না। আপনার ও সকল বন্ধু-বান্ধবের দোয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালার ওপরই আমার একমাত্র ভরসা। তিনি তাঁর বান্দা থেকে আরো কিছু খেদমত নিতে চাইলে তিনি খেদমত করার শক্তিও অবশ্যই দান করবেন।

'আনসারুল্লাহ' (আল্লাহর সাহায্যকারী) সম্পর্কে আপনার কথা আমি নোট করে রেখেছি। দ্বিতীয় বার দেয়ার সুযোগ আসলে ইনশা আল্লাহ্ শব্দের মধ্যে এমন রদ বদল করে দিব, যাতে ভয়ের কোনো কারণ না থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র আক্ষরিক পরিবর্তনই করতে পারবো। অর্থগতভাবে কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না। আমার মতে এ কথা তথ্য বহির্ভূত নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা আনসারু 'দ্বীনিল্লাহ' এবং ইয়ানসরুনা দ্বীনাল্লাহ্ বলার পরিবর্তে আনসারুল্লাহ্ এবং ইনসুরুনাল্লাহ ওসব লোকদের জন্যে প্রয়োগ করেছেন যারা তাঁর দ্বীনের দাওয়াত ও ইকামতের জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালাচ্ছেন। অথচ এ সব শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ঐ ধারণার অবকাশ সুস্পষ্টভাবেই বিদ্যমান ছিল যা আপনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। আমি তাফসীরে এ দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে পারবো না যে, (মায়াযাল্লাহ্) শব্দ প্রয়োগে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে কোনো অসতর্কতা হয়ে গেছে আর মুফাসসিরদের কাজ হলো তার সংসোধন করা। আমার মতে আল্লার গৃহীত প্রত্যেক তাবীরের মধ্যে একটি হিকমত রয়েছে। আমি সে হিকমতটিই বুঝতে ও বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি যা আনসারু দ্বীনাল্লাহর পরিবর্তে আনসারুল্লাহ শব্দের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এর জন্যে সঠিক বর্ণনা পদ্ধতি কি হতে পারে? এ বিষয়ে আমি প্রথম থেকেই চিন্তা করছিলাম এবং আপনার স্মরণ করানোর কারণে আরো বেশী চিন্তা ভাবনা করবো। কিন্তু আপনার জটিলতার অবসান ততোক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না আপনি নিজেই এ প্রশ্নের ওপর চিন্তা-ভাবনা করবেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা একটি বর্ণনা পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য বর্ণনা রীতি কেন গ্রহণ করেছেন? উল্লেখ্য, আনসারুল্লাহ্ ও আনছারু দ্বীনিল্লাহর মধ্যে স্পষ্টতঃ পার্থক্য রয়েছে। যদি শুধুমাত্র আনসারু দ্বীনিল্লাহ্ বলাই উদ্দেশ্য হতো তবে আল্লাহ্ তায়ালা এ সব শব্দ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না যে, (মায়াযাল্লাহ্) আল্লাহ্ ভুলবশতঃ আনসারুল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

প্রাপক-
মাহের আল কাদেরী
সম্পাদক – ফারান, করাচী

খাকসার,
আবুল আ'লা

পত্র – ১৬৪

১১ আগষ্ট '৬৮

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

"আযাদী" শব্দটি আমাদের মুখে উচ্চারিত হবার সাথে সাথে আমাদের মন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বৈদেশিক উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে চলে যায়। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাও আল্লাহ্ তায়ালার একটি বিশেষ নেয়ামত, ইসলামের দৃষ্টিতে যার যথেষ্ট গুরত্ব রয়েছে। কেননা ইসলাম যে জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি পৃথিবীতে চালু করতে চায় তার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির জন্যে মুসলিম সমাজ বাইরের প্রভাব প্রতিপত্তি হতে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু এদ্বারা এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিভংগিতে মুসলমানদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা অন্যদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়া প্রধানতম দাবী রাখে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার যতোটুকুই গুরুত্ব তা শুধু এ কারণে যে, এ স্বাধীনতা চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতার জন্য একটি অপরিহার্য উপকরণ।

২১ বছর আগে আমরা পাকিস্তানের মুসলমানরা নাস্তিক সম্রাজ্যবাদের গোলামীর জিঞ্জিরাবদ্ধ ছিলাম। তখন রাজনৈতিকভাবেও আমরা পরাধীন ছিলাম এবং মানসিক ভাবেও। আল্লার কাছে শুকরিয়া যে, তিনি ইংরেজ বেনিয়াদের রাজনৈতিক গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন কিন্তু তাদের মানসিক গোলামী ও অনৈসলামী নীতিমালার বদৌলতে এবং মানসিকভাবে তাদের গেলামীতে আমরা প্রথমে যেভাবে নিমজ্জিত ছিলাম পরিতাপের বিষয় আজও তা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি মিলেনি। আমাদের শিক্ষালয়, আমাদের অফিস-আদালত, আমাদের হাট-বাজার, আমাদের সমাজ, আমাদের ঘর-বাড়ী, এমনকি আমাদের শরীর পর্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এগুলোর ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য নীতিমালা, পাশ্চাত্য আচার-আচরণ ও শিক্ষা-দর্শন রাজত্ব করছে। চেতনায় কিংবা অবচেতনায় আমরা পশ্চিমা মাথায়ই চিন্তা করি, পশ্চিমা চোখে দেখি পশ্চিমাদের তৈরী রাস্তায় চলি। আমাদের মস্তিষ্কে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সঠিক সেটাই যেটাকে পশ্চিমারা সঠিক বলে আর ভুল সেটা যেটাকে তারা ভুল সাব্যস্ত করেছে। ন্যায়, সততা, সভ্যতা, নৈতিকতা, ভদ্রতা প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুর মাপকাঠি আমাদের মতে সেটাই যেটাকে পশ্চিমারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও এ মানসিক গোলামীর হেতু কি? এর কারণ এই যে, মানসিক স্বাধীনতা এবং বিজয় ও প্রাধান্যের চাবিকাঠি প্রকৃতপক্ষে চিন্তামূলক ইজতেহাদ ও শিক্ষামূলক গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে জাতি এ দিক দিয়ে অগ্রগামী যে জাতিই বিশ্বের নেতৃত্ব ও জাতির নেতৃত্ব দিতে পারে। তার চিন্তাধারাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে জাতি এ বিষয়ে অনগ্রসর তাকে অন্ধানুকরণকারী ও অনুকরণ প্রিয় হয়েই থাকতে হয়। তার চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে এমন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না যদ্বারা সে মন মগজে স্বীয় আদর্শের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মুজতাহিদ ও গবেষক জাতির শক্তিশালী চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের স্রোতধারা তাদেরকে ভাষিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে স্বস্থানে অবস্থান করার কোনো শক্তিই অবশিষ্ট থাকে না।

মুসলমানরা যতোদিন চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল ততোদিন বিশ্বের জাতিগুলো তাদেরই অনুসরণ অনুকরণকারী হলো। ইসলামী চিন্তা-ভাবনা গোটা মানব গোষ্ঠীর চিন্তার ওপর বিজয়ী হয়েছিল। ভালো-মন্দ, নেকী-বদী, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ইতর-ভদ্রের যে মাপকাঠি ইসলাম নির্ধারণ করলো তা গোটা বিশ্বের কাছে মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় বিশ্ব নিজের চিন্তা ও কর্ম কাঠামোকে সে কাঠামো অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে লাগলো। কিন্তু যখন থেকে মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাবিদ ও গবেষক সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো যখন তারা চিন্তা ও অনুসন্ধান গবেষণার কাজ পরিত্যাগ করলো, যখন তারা বিদ্যাঅর্জন ও চিন্তা গবেষণার রাস্তায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো, তখন তারা যেন নিজেরাই বিশ্ব নেতৃত্বে ইস্তফা দিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতি এ পথে অগ্রসর হলো। তারা চিন্তা-ভাবনায় সৌর্য বীর্যসহ কাজ শুরু করলো। তারা সৃষ্টি জগতের রহস্য উদঘাটন করে এবং প্রকৃতির গোপন শক্তি ভাণ্ডার তালাশ করতে থাকে। এর অনিবার্য ফল যা হওয়া উচিত তাই হলো। পাশ্চাত্য জাতি বিশ্বনেতৃত্ব পেয়ে গেলো এবং মুসলমানদেরকে তাদের রীতিনীতির সামনে এমনভাবে মাথানত করতে হলো যেমনভাবে সারা বিশ্ব কোনো সময় মুসলমাদের নীতি মালার কাছে মাথা নত করেছিল।

এখন এটাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে সেই মহান সভ্যতাই পাঁচ ছয় শত বছর যাবত নাস্তিকতা, পথ ভ্রষ্ঠতা, ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে শতাব্দীতে এ নব্য সভ্যতা স্বীয় নাস্তিকতা ও বস্তুবাদিতার

চরমে পৌছে, তা ছিল ঐ শতাব্দী যার মধ্যে মরক্কো থেকে দূর প্রাচ্য পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রগুলো পাশ্চাত্য জাতির রাজনৈতিক নীতিমালায় এবং চিন্তা প্রসূত শক্তির কাছে একই সময় পরাজয় বরণ করে। মুসলমানদের ওপর পশ্চিমাদের কলম ও তালোয়ার উভয়ের যৌথ আক্রমণ একই সাথে চলে। যেসব মন-মগজ পাশ্চাত্য শক্তির রাজনৈতিক প্রভাবে ভীত শংকিত তাদের জন্যে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান এবং তাদের বানানো সভ্যতার দাপট থেকে মুক্ত থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এতে সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের বিরাট অংশ এখনো ইসলামের সভ্যতা, এর প্রাণসত্ত্বা ও নীতিমালা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। সার্বভৌম স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীকার হাসিল হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের মন মস্তিষ্কের ওপর চেপে বসে আছে। এ প্রভাব দৃষ্টিশক্তি এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে যে, মুসলমানের পক্ষে মুসলমানের দৃষ্টিতে দেখা এবং চিন্তাবিদদের পক্ষে ইসলামী পদ্ধতিতে চিন্তা করা দুষ্কর হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থার অবসান ততোক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না মুসলমানদের মধ্যে মুক্ত চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটবে। এখন একটি ইসলামী রেনেসাঁর প্রয়োজন। আমরা যদি দ্বিতীয়বার বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে চাই, তবে সে জন্যে একটিমাত্র পথই আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন চিন্তাবিদ ও গবেষক হতে হবে, যাদের চিন্তা-গবেষণা, শিক্ষা, দর্শন ও আবিস্কারের শক্তিবলে পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তিমূল উপড়ে দিয়ে তার কবর রচনা করা সম্ভব হবে। ইসলামের গড়া চিন্তা ও গবেষণা পদ্ধতির ভিত্তিতে, ঐতিহ্যের পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বানুসন্ধানের এক নতুন দর্শন ব্যবস্থার বুনিয়াদ গড়ে তুলন। একটি নতুন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Science) প্রাসাদ নির্মাণ করুন যার ভিত্ হবে কুরআন ও সুন্নাহ্। নাস্তিক্যবাদী মতবাদের মূলোৎপাটন করে আল্লার দাসত্ব ভিত্তিক দর্শনের ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণার বুনিয়াদ কায়েম করুন। এ নব চিন্তা ও গবেষণার প্রাসাদ এমন শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন যাতে সারা বিশ্বে এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পরিবর্তে ইসলামের সত্যনিষ্ঠ সভ্যতা উজ্জলরূপে প্রজ্বলিত হয়।

খাকসার,
আবুল আ'লা

প্রাপক-
জনাব
ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন বাজুহ, রহীম ইয়ার খান।